ছায়া দোলে

শ্রীবাসব

১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা·বারো·

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
১লা অগ্রাহয়ণ—১৩৬৭

প্রচ্ছদ পট :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রক :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দুপালিত লেন
কলিকাতা-৬

।। দাম : চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ ।।

—One sound beneath, around, above,
Was moving 'twas the soul of love.......

—*Shelley*.

এই লেখকের অন্যান্য বই :

নাজমা বেগম

দেওয়ান বাড়ি

আনন্দী কল্যাণ

দূর কিনারে

এক মুঠো মাটি

কত বিনোদিনী

ছায়া দোলে

॥ এক ॥

শুক্তি দালানের খিলানে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হাসিভরা চোখের উৎসুক দৃষ্টি উঠোনে ছড়িয়ে পড়েছে। সামনের ফাঁকা জমিতে পাঁচ বছরের ছেলে নির্মাল্য ট্রাইসাইকেল চড়ে ঘোরাঘুরি করছে। ছেলের উদ্দামতা মার মনে পুলক জাগায়। তার চোখ দুটিতে একটা অদ্ভুত আলো চিকচিক করছে। বাৎসল্যের মধুর আলো।

ছেলের তুলতুলে নধর দেহটা সাইকেলের বুকে দুলছে। কালো ঢেউ তোলা ঝাঁকড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। ঘন্টি বাজিয়ে উদ্দাম গতিতে সে ঘোরাফেরা করছে আর মার মুখপানে চেয়ে খিল খিল করে হাসছে। মায়ের মনে ঘোর লাগে।

দুষ্টু হচ্ছে। মায়ের শাসন এড়িয়ে ছেলেটা দামাল হয়ে উঠছে। শুক্তি হাসে। মধুর মায়ের হাসি।

ছেলের মাতামাতি চোখে পুলক জাগালেও মন তার প্রতীক্ষা-কাতর।

রবিবার। আজ ধারা আসবে।

প্রতি রবিবারে সে কলকাতা থেকে এখানে আসে। সকালে আসে সন্ধ্যায় ফিরে যায়।

এটা ধরাবাঁধা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্তত বছর তিনচার এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি একটি সপ্তাহেও। ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ কোন কিছুই ধারার এখানে আসা-কে আটকে রাখতে পারেনি।

সে আসবেই। সকালের ট্রেন ধরে বেলা দশটার মধ্যে অবধারিত এসে পৌঁছবে।

ধারার প্রতীক্ষা করাটা শুক্তির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রবিবারের সারাদিনটি তার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত। সপ্তাহান্তের এই একটি

দিনের উপর তার একটা দাবি আছে। একটা অধিকার। শুক্তি সেখানে অসহায়। একান্ত অসহায়।

ধারার এই নিয়মিত আগমন শুক্তি পছন্দ করে কিনা, কিংবা তার মনে ধারার জন্য সত্যকার কোন সূক্ষ্ম অনুরাগ আছে কিনা কে জানে। তবে তার মনোভাবটা কৃতজ্ঞতায় সজল। ধারাকে খুশি করবার জন্য সে ব্যস্ত। কিছুটা ভয় কিছুটা ঈর্ষা মাঝে মাঝে তার মনকে কামড়ে ধরে। কিসের ভয়, কিসের ঈর্ষা নিজেই বুঝতে পারে না।

একটা বাষ্পের জোয়ারে তার বুকটা দুলে ওঠে। চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য ছেলেকে ব্যাপ্ত করে দেখে নেয়। ওই ওর জীবনের একমাত্র আনন্দ। ওর একমাত্র অবলম্বন। ওকে ঘিরেই ওর জীবনের আকাশ আলোকোজ্জ্বল। ও ছাড়া ওর আর কোন চিন্তা নেই। নিজের চিন্তাকে সে কোনদিন বড় করে দেখেনি। পরের চিন্তায়, পরের ভার কাঁধে নিয়েই এতোদিন তার কেটেছে। প্রথম যৌবনে সে ভালোবেসে নিজেকে বলি দিয়েছে। সেই তীব্র ভালোবাসা বাৎসল্যের রসে দানা বেঁধে তার জীবনকে কতকটা সার্থকতায় ভরিয়ে তুলেছে। নইলে আর সবটাই তাব অন্ধকার। জীবনে আর কোন প্রত্যাশা নেই। নেই কোন সুদূব সম্ভাবনা।

বড় করুণ আর কোমল সে। মুখের মৃদু হাসিটুকু পর্যন্ত বিষন্নতায় ভিজে। সাদা ধপধপে চিনে মাটির পুতুলের মত তার চেহারা। যেমন নিস্পৃহ তেমনি ভঙ্গুর। সোজা চোখ তুলে কারুর পানে মুখোমুখি তাকাতে পারে না। বনফুলের মত সে নিজেকে গোপন করতে চায়। প্রচার করতে চায় না।

ছেলে, ছেলে, ছেলে। ছেলে ছাড়া তার জীবনে আর কোন শখ নেই। আনন্দ নেই। আবার অশান্তি ও ওই ছেলেকে নিয়েই। ওর জন্যই যতকিছু আশঙ্কা উদ্বেগ।

রাঁধুনি রমা এসে খবর দিল, দুধ গরম হয়েছে।

শুক্তি ছেলেকে ডাক দিল, উঠে এসো নিমু।

—আরেকটু পরে মা। একটু—

গাড়ি চালিয়ে দূরে দৌড় দিল নির্মাল্য।

শুক্তি ধমক দিল, না, আর নয়। দুধ জুড়িয়ে যাবে। রোদ উঠেছে। উঠে এসো।

মায়ের গলার ধমকের সুরে বুঝিবা গাড়ির চাকা বন্ধ হয়ে গেল। ছেলে রাঙা মুখে গাড়ি থেকে নেমে মায়ের কোলের কাছে এসে দাঁড়াল।

গাঁট্রা গোট্রা নধর ছেলে। মা তাকে কাছে টেনে নিয়ে আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, খাবে চলো। বেলা হয়ে গেছে। খিদে পায়নি?

একগুঁয়ে ছেলে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বললে, না। পায়নি।

ছেলের মাথা নাড়ার ভঙ্গি দেখে মা হেসে ফেললে। তার চিবুক ধরে গলার সুরটা মোলায়েম কবে বললে, ওমা, সে কি কথাগো, এতোখানি বেলা হলো খিদে পাবে না? নিশ্চয় পেয়েছে। খেতে বসলেই বুঝতে পাববে। পেটেব ভেতব খিদে লুকিয়ে থাকে।

মায়ের হাত ধবে ছোট ছোট পা ফেলে বাড়ির ভিতব যেতে যেতে নিমু বললে, খিদে কি চোব নাকি যে লুকিয়ে থাকবে?

শুক্তি হেসে উঠল। সস্নেহে তাব মাথার চুলগুলো নাড়তে নাড়তে বললে, খেয়ে দেয়ে আমবা আজ চিলে কোঠায় 'চোর' 'চোব' খেলবো। তুই, আমি আব তোর মাসীমা।

—মাসীমা আবার খেলবে নাকি? খেলতে জানেই না। ছুটতে গিয়ে পড়ে যায়। 'কু' দিতে জানে না। বুড়ি ছুঁতে পারে না।

শুক্তি হেসে লুটোপুটি।

—আজ মাসি-মা আসুক। বলে দেব।

—দিও।

এমনি ভাবে ছেলেটা চোখ তুলে মার মুখপানে তাকাল যেন সে কারুকে পরোয়া করে না।

শুক্তি জিজ্ঞেস করল, মাসীমাকে তুই ভয় করিস না?

—না।

—তাকে ভালো বাসিস না?

—না। যে বকে—

শুক্তি চোখ দুটি কপালে তুলে বললে, সে তোকে অতো ভালোবাসে। তোকে দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে ছুটে ছুটে আসে আর তুই তাকে ভালোবাসিস না?

—না। আমার ভাল লাগে না। কেবল ধমক দেয়, আর—

শুক্তি অবাক হয়ে তার বিরক্তিভরা কচি মুখের পানে চায়। কিন্তু অন্তরের গভীরে সে যেন একটা স্বস্তি পায়। তার গোপন ভয়ের আগুনে কে যেন অদৃশ্য হাতে জল ঢেলে দেয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে আস্তে আস্তে শুক্তি বলে, ছিঃ! ও কথা বলতে নেই নিমু। মাসীমা তোকে কত ভালোবাসে। শুধু তোকে দেখবার জন্যেই রবিবারে কলকাতা থেকে এতো দূরে ছুটে আসে।

নিষ্ঠুর ছেলে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলে, কেন আসে? ওর নিজের ছেলে নেই?

চমকে ওঠে শুক্তি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ সুরে বলে, না। নেই বলেই তো তোকে ভালোবাসে। তোকে দেখতে আসে।

শুক্তির কি হলো কে জানে। তার মুখখানা শুকিয়ে গেল। তার ভাবনা চিন্তাগুলো সব ঘুলিয়ে গেল। পাঁজরের নিচে একটা অব্যক্ত যাতনা অনুভব করল। তার চোখ দুটি জ্বালা করতে লাগল।

নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। দশটা বাজতেই যেন মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল, ধারা। হাসিমুখে বাড়িতে ঢুকেই নির্মাল্যকে বুকে তুলে নিল। হাসিমুখে শুক্তিকে কুশল সম্ভাষণ জানালো।

এই হাসিটুকুই ধারার সম্পদ। এটা তার স্বভাবের অঙ্গ। সে দুঃখেও হাসে। সুখেও হাসে। হাসি মাখিয়ে বিধাতা তার মুখখানি গড়েছেন। ধারা প্রায় শুক্তির সমবয়সী। কিন্তু বাড়ন্ত গড়ন। দেখলে মনে হবে শুক্তির চেয়ে বয়সে বড়। দুঃখের দুর্যোগ তার তারুণ্যের উপর দাগ রেখে গেছে। দুঃখের মধ্যেই কিন্তু তার রূপের ঝলক বাড়ে। দুঃখই তার রূপের লাবণ্য।

শুক্তির সঙ্গে ধারার রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তাকে ভালোবেসেছে সে মনপ্রাণ দিয়ে। এত ভালোবাসা এত শ্রদ্ধা সে আর কোন মানুষকে দিতে পারেনি। শুক্তিও এই মেয়েটিকে অজস্র স্নেহ দিয়ে আপন করে নিয়েছে।

তাদের দুজনের এই ভালোবাসা জমাট বাঁধল এই শিশুটিকে কেন্দ্র করে। আসলে তাদের পরিচয়ের সূত্রপাত্র এই শিশুর জন্মকালে। পাঁচ বছর আগে এক প্রসূতি সদনে।

একই সময়ে শুক্তি ও ধারা দুজনে এক মাতৃসদনে ভর্তি হলো। শুক্তি কেবিন ভাড়া নিয়ে। ধারা ফ্রি বেডে। শুক্তি প্রসব করল এক মৃত সন্তান। ধাবা প্রসব করল একটি পুত্র সন্তান।

মৃত-বৎসা শুক্তি যখন শোকে মুহ্যমান সেই সময় নার্শ একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছেলেকে দেখিয়ে ফিসফিস কবে শুক্তিকে বললে, এটাকে নেবে ?

নার্শ শুক্তির বিছানার পাশে ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে কার্যান্তরে চলে গেল। প্রাণচঞ্চল শিশু হাতপা নাড়তে শুরু কবলে। শুক্তি দু'চোখ ভরে ছেলেটাকে দেখল। তার অশ্রুসিক্ত নিস্প্রভ চোখে একটা আশ্চর্য দীপ্তি ফেটে পড়ল। শূন্য বুকে পূর্ণিমার জোয়ারের মত বান ডাকল। নতুন দুধের অস্থির সঞ্চারণে তার ভরা ভরতি বুক দুটো টন টন করে উঠল। ছেলেটাকে বুকে তুলে নেবার জন্য তার হাত দুটো নিসপিস করতে লাগল। তার স্পর্শ পাবার জন্য সমস্ত শরীর আঁট-হয়ে উঠল। সে নিস্পলক লোচনে ছেলেটার পানে চেয়ে রইল।

নিজের ছেলেকেঁ সে চোখে দেখেনি। ফরশেপ ডেলিভারী। তিন দিন সে অজ্ঞান হয়েছিল। কেমনটি সে হয়েছিল কে জানে।

ছেলেটা হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠল।

শুক্তি আচম্বিতে তাকে কোলে তুলে নিল। ছেলেটার কচি দেহের তাপে পাকা ফলের মত বুক থেকে রস গড়িয়ে পড়ল। শুক্তি তার অনাবৃত বুকের রস গেলে ছেলেটার ঠোঁটে ঢেলে দিল। সে চোখ বুঁজে আকণ্ঠ পান করল তার বুকের সুধা।

শুক্তির দেহ শিথিল হয়ে এল। ছেলেটার ঘনিষ্ঠ স্পর্শে যেন তার সারা দেহ গলে যাচ্ছে মনে হলো। ছেলেটার উত্তাপ যেন তার অস্থি মজ্জায় এমন কি চিন্তার গভীরে পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। কালো চিন্তা যেখানে হিম- শীতল রক্তের মত জমাট বেঁধেছিল সেই চিন্তাকে পর্যন্ত যেন গলিয়ে দিচ্ছে। সে এক বিস্ময়কর অনির্বচনীয় অনুভূতি। তার ভিতর বাহির তেতে উঠেছে। কী যে হচ্ছে নিজেই বুঝে উঠছে না।

অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে সে ছেলেটাকে নাড়াচাড়া করল। প্রসবের পর প্রসূতি যেন দুচোখ ভবে গর্ভের সন্তানকে প্রথম নিরীক্ষণ করছে।

এমনি তন্ময় হয়ে সে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসেছিল সে জানতেই পারেনি নার্শ এসে তার কাছে দাঁড়িয়েছে।

চোখোচোখি হতেই শুক্তি নার্শকে প্রশ্ন করল, কে এর মা?

শুক্তি এই প্রথম নার্শের সঙ্গে কথা বলল।

নার্শ মৃদু হেসে বললে, তুমি এর মা। একে তুমি নাও।

—কেন, এর মা নেই?

—আছে। তুমি চাইলে সে একে দিয়ে দেবে। শুক্তি শূন্য দৃষ্টিতে নার্শের মুখের পানে চাইল।

ছেলেটা শুক্তির কোলের ভিতর উসখুস করে উঠল। শুক্তি চোখ নামিয়ে দেখল ছেলেটা পিট পিট করে যেন তার মুখের পানে চেয়ে

আছে। তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপুনি জাগল। চোখ দুটি জলে ভরে এলো।

নার্শ ছেলেটাকে খাইয়ে তার কাছেই রেখে গেল। নিয়ে গেল না।

বিকেলের দিকে নার্শের সঙ্গে ধারা এলো শুক্তির কেবিনে। ছেলেটা শুক্তির পাশে ঘুমুচ্ছে। ধারা নিঃশব্দে ছেলেটার পানে মুহূর্ত চেয়েই শুক্তির পানে তাকাল। চোখে পড়ল শুক্তির কপালে সিদুঁর নেই, সে বিধবা।

—তোমার ছেলে ?

শুক্তি চোখ তুলে প্রশ্ন করল।

—হাঁ। তোমাকে দিলুম। তুমি ওকে নাও। তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে। আমি পারবো না।

একটু থেমে মরণোন্মুখ ভঙ্গিতে ধাবা বললে, আমি নিবাশ্রয়। নিঃসম্বল।

—তোমাব স্বামী ? এব বাপ ?

—নিরুদ্দেশ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধারা দীন দুর্বলের মত শুক্তির বিছানার এক পাশে বসল।

শুক্তি নিঃশব্দে তার বিবর্ণ চোখের অসহায় উজ্জ্বলতার পানে চেয়ে দেখল। তাকে অত্যন্ত শূন্য মনে হল। শীতের নিষ্পত্র গাছের মতই সে শূন্য। শুধু শূন্য নয়। বিষণ্ণ আব বিপন্ন। এই ছেলেটাই তাকে একান্ত বিপন্ন করে তুলেছে। ছেলের বোঝা বইবার মত শক্তি নেই মায়ের মেরুদণ্ডে।

শুক্তির দৃষ্টি কান্নায় কালো হয়ে উঠল, মায়ের বিপন্নতা দেখে। মা সন্তানের বোঝা নামিয়ে নির্বিঘ্ন হতে চায়! তার কেমন আশ্চর্য লাগে। অকরুণ মনে হয়।

ধারার অকপট দারিদ্র্যে শিউরে উঠল শুক্তি। ছেলে নিয়ে সে

করবে কি? আশ্রয় নেই। আপনজন নেই। এই স্বাস্থ্যহীন শরীরে শিশু বুকে নিয়ে জীবিকার্জনের শক্তি কোথা? শিশুকে বাঁচাবে কি খাইয়ে? নিজে না খেতে পেলে বুকে তুধ জোগাবে কোথা থেকে? রক্ত কোথা শরীরে?

শুক্তি চেয়ে চেয়ে দেখে তার মুখপানে। ভদ্র চেহারা। ভদ্র ঘরের মেয়ে। তুঃখের কাটফাটা রোদে পুড়ে এমনি দশা হয়েছে। পাতা খসে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তুজনে। তারপর ধারা একসময় বললে, হ্যাঁ, তুমি ওকে নাও। তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে। ও তোমাব শূন্য বুকে ফুল ফোটাতে পারবে।

—আর তুমি?

- ও বেঁচে আছে জানতে পারলেই আমি সুখে মরতে পারবো। ও নিরাপদ বুঝতে পারলেই আমি স্বস্তি পাবো।

নার্শ কথা বলল। ধারাকে প্রশ্ন কবল, ভবিষ্যতে একে ফিবে চাইবে না?

—না। তোমাকে বলেছি তো।

—এর পবিচয়?

শুক্তির পানে চেয়ে ধাবা বললে, ওব সন্তান। ওই ওব মা হবে। মায়ের পরিচয় হবে ছেলেব পরিচয়।

একটু থেমে ধাবা হঠাৎ ছেলেকে স্পর্শ কবে বললে, কোন ভয় ভাবনা নেই ভাই। আমি একে নিঃস্বত্ব হয়ে তোমাকে দিলুম। এ তোমারি ছেলে। আমার কোন দাবি দাওয়া রইল না। আমাকে বিশ্বাস করো।

নার্শ প্রশ্ন কবেছিল: বিনিময়ে?

মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ধাবা উত্তর দিয়েছিল, আমি সন্তান বিক্রি করিনি। ওর শূন্য বুক ভবাবার জন্যে ওকে আমি দিলুম। যদি বেঁচে থাক কখনো কখনো গেলে যেন ওকে চোখের দেখা দেখতে পাই।...

নির্মাল্য ধারার সেই সন্তান।

পাঁচ বছর পেরিয়ে ছয়ে পা দিয়েছে।

লোকে জানে শুক্তির স্বামীর মৃত্যুত্তরজাত সন্তান। ধারা আর শুক্তির মাঝের এই গোপনতাই তাদের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ করে তুলেছে।

অনেক দুঃখের পথ পেরিয়ে ধারা কলকাতার একটি ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারে গভর্নেশের কাজ পায়। এবং তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে কলকাতা থেকে চন্দননগরে শুক্তির বাড়িতে আসে নির্মাল্যকে দেখতে।

নির্মাল্য ধারাকে মাসী বলে ডাকে।

ধারাও বুঝিবা ভুলে গেছে যে সে তার মা। ছেলেটার বাড়ন্ত গড়ন ও অপরূপ শ্রী দেখে সে মোহিত। সে যে তারি দেহের একটা অঙ্গ সে কথা সে ভাবতেও পারে না। আচমকা দূর থেকে তাকে দেখে তার বাপের কথা মনে পড়ে যায়। বাপের মত একটা স্পর্ধা যেন তার মুখে ফুটে আছে। ধারার সমস্ত শরীর অসহিষ্ণুতায় কেঁপে ওঠে। সে চোখ বুজে মনে মনে বলে, ছেলে যেন বাপের মত নিষ্ঠুর হয়ে না ওঠে।

শুক্তির কিন্তু ছেলে বশ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। তার কথায় ছেলেটা যেন ওঠে বসে। আর এমনি মিষ্টি করে মা' বলে ডাকে। ধারা নিজের ভিতরে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করে। ঐ ডাক হয়তো তাকে জীবনের এক নতুন পথে উত্তীর্ণ করে দিতে পারতো। তার ভীরু চাপা মন একটা অজানা বেদনায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। নিজেকে তার অত্যন্ত অসহায় মনে হয়।

প্রতি সপ্তাহে সে এখানে আসে। নিজে আসে কিংবা কেউ তার জট ধরে টেনে আনে সে বুঝতে পারে না। কিন্তু কেন সে আসে? কিছু পাবার লোভে কি সে আসে? সত্যই কি কিছু পায় সে, না কিছু হারিয়ে যায়? হিসেব তো সে করেনি কোনদিন। কোন কিছু একটা নিয়ে তো মানুষকে বাঁচতে হবে। এও তেমনি একটা নেশা।

নেশার ঘোরে, স্বপ্নের ঘোরে সে সারাটা পথ চলে আসে। আবার অবসন্ন ক্লান্ত মনে ফিরে যায়। নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ আর দুর্বল মনে হয়। যেন নিজের দেহ থেকে খানিকটা রক্ত দিয়ে এলো অন্যের শরীরে। এর জন্য তার দুঃখ নেই। ক্ষোভ নেই। বরং খানিকটা আনন্দই সে পায়।

এ যেন নিয়ম করে ব্রতপালন করা। মনের শান্তির জন্য দেহকে উপবাসী রাখা। এ তাকে করতেই হবে। এর হাত থেকে তার নিস্তার নেই।

সে বুঝতে পারে না এটাকে শুক্তি কেমন ভাবে নেয়। তার ঘন ঘন আসা যাওয়াটা সে পছন্দ করে কিনা। চেষ্টা করেও সে বুঝতে পারে না। শুক্তি চাপা মেয়ে। মুখের ভাবে তার মনোভাব বোঝা শক্ত।

বাইরেটা তার হাসিখুশি। ধারাকে দেখে সে খুশিই হয়। তার ভিতরের সঙ্কুচিত ভয়ের ভাবটা তো ধারা দেখতে পায়না।

হ্যাঁ। ভিতরে ভিতরে সে সঙ্কুচিত বই কি। ছেলেকে ধারার হাতে তুলে দিয়ে সে কিছুতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

একটাকে তো দুজনে ভাগ করে নেওয়া চলে না। ছেলে বড় হচ্ছে। বুদ্ধি বাড়ছে। শুক্তির মনের সংশয়ও সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভঙ্গিতে তাকে গ্রাস করছে। যদি তার সত্যকার পরিচয়টা ধারা আড়ালে ছেলের কাণে তুলে দেয়। তার সংশয় বিচলিত মন তাই কিছুতে ছেলেকে চোখের আড়াল করতে পারে না। ধারার কাছে ছেলেকে একলা রেখে আড়ালে যেতে তার মন সরে না।

মাঝে মাঝে নিজেরি কেমন বিসদৃশ ঠেকে। নিজের মনের সঙ্কীর্ণতায় নিজেই লজ্জা পায়। নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হয়। দাতার দানকে সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারে না।

ধারা এসে বলে, তাকে অন্তত তিনমাসের জন্য মনিবের সঙ্গে বাইরে যেতে হবে, কোন শৈলাবাসে। তার মনিব সরকারী বড় চাকুরে। আপিস থেকে ছুটি নিয়েছে।

শুক্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, মনিব বললে যেতে হবে বই কি। উপায় নেই।

—কিন্তু তিনমাস ছেলেটাকে না দেখে থাকবো কেমন করে?

শুক্তি মৃদুহাসি হেসে আশ্বাসের কণ্ঠে বলে, তিনমাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

ধারা উদাস শূন্য চোখে তাবপানে চেয়ে বলে, তিনমাস কেন, তিন বছবও কেটে যেতে পারে। তাব জন্য নয়। চোখেব একটা বিলাসিতা বইতো নয়। অন্ধেব আলো দেখবাব বাসনাব মত।

শুক্তি করুণ চোখে তাবপানে চায়। কিছুটা যেন ঈর্ষাকাতার চোখে।

শুক্তি নির্মাল্যকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, মাসীমা তিনমাস আসবে না। বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে।

—যাকগে।

—তোর মন কেমন কববে না?

—ছাই।

ধাবার মুখখানা ছাই-এব মত সাদা হয়ে গেল। শুক্তি তাব পিঠে একটা আলতো চাপড় দিয়ে ধমক দিল। খবর্দাব। বলতে নেই।

একগুঁযে ছেলে মাথা নিচু কবে মুখ ঝুলিযে বসল।

একসময় ধাবা হাসতে হাসতে শুক্তিকে বললে, আমাব ভয় হয় বাপের মত ছেলেটা কাটখোট্টা আর নিষ্ঠুর না হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে শুক্তি ধারাব মুখেব পানে তাকায়। ওর তো দেব অংশে জন্ম নয় যে ও দেবতা হবে। শুক্তি ওকে মানুষই গড়ে তুলবে। সংসার যার গৌরব কবতে পাববে।

॥ দুই ॥

নির্মাল্যর জন্য মাষ্টার এসেছে।

ছবির বই, শ্লেট, পেন্সিল নিয়ে সে পড়তে বসেছে। কদিন কেটেছে শুধু মাষ্টারের সঙ্গে তার ভাব জমাতে। তার সঙ্গে বেড়িয়ে, মাঠে খেলা করে, দৌড়ঝাঁপ করে মাষ্টারকে তার সঙ্গে ভাব করতে হয়েছে।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাছাই করে মাষ্টারকে নিযুক্ত করেছে শুক্তি।

গার্জেন টিউটর। বি-এ পাশ।

সারাক্ষণ তার কাছে কাছে থাকবে।

এরি মধ্যে ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে চায় না শুক্তি। তাকে চোখের আড়াল করে পথে ঘাটে ছেড়ে দিতে মন সরে না। তা ছাড়া স্কুলে কত রকমের ছেলে। কার সঙ্গে মারধোর করবে। সঙ্গ দোষে হয়তো বা স্বভাব বদলে যাবে।

তাই ভেবে চিন্তে শুক্তি একজন গার্জেন টিউটার নিযুক্ত করল।

পাশাপাশি দুখানা ঘর। একখানা মাষ্টারের। একখানা নিমুর পড়বার। ঘর সাজানো হলো।

মাষ্টারের নাম কল্যাণ। বয়সে তরুণ। ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। মুখে চোখে কেমন একটা বিষণ্ণ মনমরা ভাব।

যতক্ষণ নিমু কাছে থাকে ততক্ষণ সে বেশ হাসিখুশি। ছেলেমানুষের সঙ্গে নিজেও রীতিমত ছেলেমানুষ সেজে খেলাধুলো করে। হাসে। গল্প করে। নিমু অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে শোনে। এই ক'টি দিনেই নিমুকে সে পোষ মানিয়ে নিয়েছে। নিমুকে সে বশ করে

নিয়েছে। শুক্তি মনে মনে হাসে। খুশি হয়েই হাসে। মাষ্টার ছেলে বশ করবার যাছু জানে। শিক্ষায় ধারা জানে।

নিমু কাছ থেকে চলে গেলেই কিন্তু কল্যাণ অন্য মানুষ। তার মুখের হাসি নিভে যায়। মুখে কালো গাম্ভীর্যের মুখোস এঁটে সে শূন্য উদাস দৃষ্টিতে দূরপানে চেয়ে থাকে। কী যে ভাবে সেই জানে। বাড়ির আর কারুর সাথে সে আলাপ করে না। হাসে না। অপ্রয়োজনে কোন কথা বলে না। মাপ করে, ওজন করে সে কথা বলে।

শুক্তি দূব থেকে লক্ষ্য করে।

কবি, ভাবুক না অভাবের তাড়না?

পথে ঘাটেও ঐ একই ভাব। পাড়া প্রতিবেশীরা তার সুদর্শন মুখের পানে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। হাসে না। কথা বলে না। কারুর পানে তাকায় না। মেয়েবা ভাবে কেমনতর পুরুষ? অমন সুন্দর মুখে প্রেমের আলো নেই কেন? অমন ড্যাবডেবে চোখে ভালোবাসার ভাষা নেই কেন? এমন মনমরা কেন?

ওর চোখের দৃষ্টি দূব আকাশের বর্ণ সমারোহের পানে। দিগন্তের শ্যামোচ্ছ্বাসেব পানে। প্রকৃতিব সৌন্দর্য সম্ভারের দিকে। তার নিঃশব্দতাকে লজ্জা বা সঙ্কোচ বলা যায় না। সাগবের মত স্বাভাবিক একটা গাম্ভীর্য তাকে ঘিবে রয়েছে। তাব গাম্ভীর্যে উগ্রতা নেই। বরং কোমলতা আছে খানিকটা।

বাড়ির দাসদাসীরা তার এই গাম্ভীর্যকে সমীহ করে। শুক্তির অল্পবয়সী রাঁধুনী রমা তাকে খেতে দিতে গিয়ে এক হপ্তার মধ্যেই রীতিমত তার প্রেমে পড়ে গেল। অথচ মাষ্টার গ্রাহ্যই করে না। তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই সে দিকে। খেতে বসে পরিবেশনকারিণীর মুখের দিকে একবার চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত।

কোন কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না। নিজের পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর নেই। নিজেব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের সম্ভোগ, নিজের জীবন বলতে যেন তার কিছু নেই। জীবন যেন তার

নিজের নয়। পরের জন্য উৎসর্গ করা জীবন। কাজটাকে সে ভালভাবেই করে। কর্তব্যের সমস্ত দায়িত্ব তার নিজের। কারুর কোন সাহায্য সে নেবে না। মুখের চেহারা দেখলে মনে হবে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা, অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অনেক দুঃখের পথ পার হয়ে তাকে আসতে হয়েছে। অনেক উপেক্ষা অনেক অনাদর তাকে বুক পেতে সইতে হয়েছে। তবু সে ভেঙ্গে পড়েনি। আসলে লোকটা অসামান্য না হলেও তার ভিতরে একটা শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে মনে হয়।

কিন্তু এতো উদাস আর এতো নির্লিপ্ত কেন? শুক্তির মনে হয় সে একান্ত বিচ্ছিন্ন আর একাকী। বোধ হয় জীবনে স্নেহের কোন বন্ধন নেই। কিংবা যা ছিল তা হারিয়েছে। সব হারিয়ে দেউলে হয়ে গেছে।

কিন্তু যতই নির্লিপ্ত আর উদাসীন হোক নিমু সম্বন্ধে সে সদাই সজাগ আর সচেতন। নিমুকে দেখলেই তার মুখে হাসি ফোটে। সে মুখর হয়ে ওঠে। তার চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শুক্তির প্রসন্নতা নিমুর প্রতি তার অনুরাগে।

পক্ষকাল পরে হঠাৎ একদিন কল্যাণ শুক্তির সামনা-সামনি এসে পড়তে শুক্তি বোধ হয় সৌজন্যতার খাতিরে হাতদুটি কপালে ঠেকিয়ে তাকে নমস্কার করে প্রশ্ন করলে, এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?

—কই, না তো।

ঘাড় নেড়ে আনত ভঙ্গিতে সক্ষিপ্ত উত্তর দিল কল্যাণ।

—কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন কিংবা টাকা পয়সার দরকার হলে সরকার মশায়কে বলবেন। তিনি আগাম দেবেন। আমার বলা আছে।

কল্যাণ নিঃশব্দে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ খুললো না।

শুক্তি দৈবাৎ প্রশ্ন করল, বাড়িতে আপনার কে কে আছে?

এইবার কল্যাণ মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে চোখ তুলে সোজা তার মুখের পানে তাকাল। তার চোখে চোখ রোখে নিতান্ত নিরাসক্তের মত উত্তর দিল, সব ছিল। এখন আর কেউ নেই।

শুক্তির কৌতূহলকে নিভিয়ে দিল এক ফুঁয়ে। তার উত্তরের মাঝে ধূসরতা নেই অস্পষ্টতা নেই এতোটুকু। শুক্তি নির্বাক ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কেউ নেই। সব ছিল। প্রিয়জন ছিল। ভোগের উপকরণ ছিল। আশা আশ্বাস ছিল। এখন আর কেউ নেই। সব হারাল কেমন করে? কোথায় গেল তারা? কে কেড়ে নিল? কার চক্রান্তে কার ছলনায় সব হারাল? কে তাকে এমন কাঙাল করে দিল? কে তাকে সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল? তারা আজ সব কোথায়?

শুক্তির মনে করুণার ঢেউ খেলে যায়। কেমন এলোমেলো হয়ে যায় তার ভাবনা চিন্তাগুলো। দুঃখীর উপর করুণা তার চিরদিনের। নিজের দুঃখ বেদনা দিয়ে সে পরের দুঃখকে অনুভূতিগোচর করেছে। চোখের জল তার আজো শুকোয়নি। অশ্রান্ত অশ্রু রোধ করেই সে এই ঐশ্বর্যকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে। তেইশ বছর বয়সে দেহমনের বসন্তশোভাকে ছাই চাপা দিয়ে তাকে রীতিমত তপস্বিনী হতে হলো। এই বয়সেই সে আচারনিষ্ঠ নিরেট বিধবা। আর কলমের—জোড়-লাগানো সন্তানের জননী। তার ক্ষণভোগ্য দাম্পত্যের শিথিল ভিত্তির উপর যে মাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল সেই বাৎসল্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে এই ছেলেটিকে আশ্রয় করে সে যশোদা সাজল।

তবু তার অদৃষ্টকে অনেকেই হিংসা করে। তার অন্তরের রক্তাক্ত ক্ষতটা তো কারুর চোখে পড়েনা। তার জীবনের বাইরেটায় একটি জনবিরল অবিচ্ছিন্ন শান্তি। সুস্নিগ্ধ জীবনের একটি নিরাপদ আশ্রয়। তা ছাড়া আর জীবনের কোন আশা আশ্বাস নেই। প্রাণধর্মের কোন প্রকাশ নেই। সংসারের বাইরে জীবনের আর কোন পরিকল্পনা

নেই। সে বড় বাড়ির বউ। সে নিমুর মা। এর বাইরে আর তার কোন পরিচয় নেই।

রাত্রে বিছানায় ঘুমন্ত ছেলের পাশে এসে বসল শুক্তি। নিমু অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার মুখের পানে চেয়ে শুক্তির মনে হলো ঘুমন্ত নিমুকে আরো সুন্দর দেখায়। মুখখানির উপর একটি ঘুমের আবেশ মাখানো। ঈষৎ ভিন্ন ঠোঁট দুখানি নিশ্বাসের সঙ্গে কাঁপছে। ঠোঁটের ফাঁকে কচি দুটি দাঁত ঝকঝক করছে। ঘুমন্ত ছেলের এ এক অপরূপ শান্তির রূপ। জানালার শার্সি দিয়ে তার মাথার কালো চুলে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়েছে। শুক্তি চোখ তুলে একবার বাইরের আকাশের পানে তাকাল। নির্মল নীল আকাশে কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাঁদ। ক্ষয়পক্ষের চাঁদ-যেন দুঃখী কাঙালিনী মেয়ের মত বিষণ্ণ আর বিমর্ষ। শুক্তি চোখ ফিরিয়ে আবার ছেলের পানে তাকাল। জীবনের একমাত্র অবলম্বন। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের গভীর তলা থেকে বেরিয়ে এল। তার মনে হলো এই পৃথিবীর মাঝে সে স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিল। সে ব্যর্থ হয়েছে। একে পেয়েও সে সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারে নি। একটা অপার শূন্যতার উপলব্ধি তার সত্তাকে কাঁপিয়ে তুলল। তার চোখ দুটি জলে ভরে এল।

ঘরের আবছা অন্ধকারে তার ধূসর অতীত নগ্ন হয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। অতীত তো সুদূর নয়। কালপ্রবাহে ক্ষয়ক্ষীণ নয়। ধূলিধূসর নয়।

এই তো সেদিনের কথা।

আঠারো বছরের শুক্তি প্রেমের জন্য, প্রিয়জনকে সুখি করবার জন্য নিজেকে বলি দিল।

হ্যাঁ। বলি দিয়েছিল নিঃসন্দেহ। সব জেনে শুনেই সে চোখ বুঁজে আত্মসমর্পণ করেছিল। নিজেকে উৎসর্গ করেছিল অন্ধ অচেতন হয়ে।

কবে কেমন করে সে সমরজিতকে ভালবেসেছিল সে কথা হয়তো

তার মনে পড়ে না। তবে সে ভালবাসবার আগেই সমর যে তাকে ভালবেসেছিল সে কথা তার মনে আছে। সমর ছিল বড়বাবুর একমাত্র সন্তান। এই অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরসাধক। শুক্তির বাবা তাদের রানীগঞ্জের কোলিয়ারীতে চাকরি করতো। সেই কয়লা খনি অঞ্চলেই শুক্তির শিশুকাল অতিবাহিত হয়েছে। কয়লাখনির একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় শুক্তির মা মারা গেল এবং তারা কলকাতা চলে এলো। বড়বাবু তার বাবাকে কলকাতার আপিসে কাজে ভর্তি করে নিলেন এবং তাদের পিতাপুত্রীকে আশ্রয় দিলেন তাঁদের বহির্বাটির একাংশে।

হ্যাঁ। শুক্তির মনে আছে বই কি সমরের সঙ্গে তার পরিচয়ের প্রথম দিনটি।

বাড়ি ফেরবার পথে সমরের পকেট থেকে একখানা রুমাল পড়ে যায় বার্-বাড়ির উঠোনে। চোখে পড়ে শুক্তির। রুমালের খুঁটে বাঁধা ছিল দুখানা একশো টাকার নোট।

শুক্তি রুমালখানা কুড়িয়ে নিয়ে সমরকে ফিরিয়ে দিতে গেল। নীল বর্ডার দেওয়া খয়েরী রঙের রেশমী রুমালখানা হাতে মেলে ধরে শুক্তি আনতমুখে মৃদুকণ্ঠে বললে, বাবু, আপনার রুমাল।

—কে বললে আমার রুমাল ?

চকিত সোৎসুক দৃষ্টিতে সমর তার সুন্দর মুখের পানে তাকাল। শুক্তি যে সুন্দরী সেইদিন সে প্রথম উপলব্ধি করল সমরের প্রশংসমান মুগ্ধ দৃষ্টির মৌন ঘোষণায়।

—আপনারই বাবু। নোট বাঁধা রয়েছে।

রুমালখানা হাতে নিয়ে মৃদু হেসে সমর বললে, সত্যি তো। আমারই। কিন্তু আমাকে তোমায় 'বাবু' বলতে কে শেখালে ?

—কেউ শেখায়নি বাবু !

—আবার বাবু ?

সমর হেসে উঠল। বললে, আমাকে 'বাবু' বলবে না।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে শুক্তি জবাব দিল, আচ্ছা বাবু!

হাসি চাপতে পারল না সমর। এমনি জোরে সমর হেসে উঠল যে সেই দীর্ঘ হাসির তোড়ে শুক্তি কেঁদে ফেলল।

শুক্তির চোখে জল দেখে সমর বোধ হয় লজ্জিত হলো। সে শুক্তির হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললে, অন্যায় হয়েছে আমার। তোমার মনে আঘাত করতে চাইনি। রাগ করো না। চোখের জল মোছ। তোমার নাম কি?

—শুক্তি।

—রমেশ বাবুর মেয়ে তো তুমি?

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল শুক্তি।

সমর তার হাতখানা নাড়তে নাড়তে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, দেখো শুক্তি, আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় ও সব মাথাভারী ভব্যতার কোন দরকার নেই। আমি ভালোবাসি না। আমরা সব সমান। আমাকে বড় ভাববে না। নিজেকে ছোট ভাববে না। আমরা বন্ধু। কেমন?

ফিক করে হেসে ফেলল শুক্তি। সমরও সঙ্গে সঙ্গে হাসল। মাথা ঘুরিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে শুক্তি তার মুখের পানে তাকাল। ভারি মিষ্টি লাগল তার মুখের হাসি। তার কথার সুর। শুক্তির বুকের রক্ত চনচন করে উঠলো।

সমর তার মায়ের সঙ্গে শুক্তির আলাপ করিয়ে দিল। শুক্তির সঙ্গে মায়ের চোখের আলাপ ছিল, মুখের আলাপ হলো। দুশো টাকা শুদ্ধ রুমালখানা ছেলে পথে ফেলে দিয়ে এসেছিল, মেয়েটি কুড়িয়ে এনে ফেরৎ দিয়েছে। তার সততাকে প্রশংশা করবে বইকি মা। একটু কৃতজ্ঞতা ভরা হাসি হেসে মা তার চিবুক ধরে আদর করল। কাছে টেনে নিয়ে নাম জিজ্ঞেস করল। কাছে বসিয়ে আলাপ করতে করতে একটু মিষ্টিমুখ করাল। শুক্তির বুকের নিচেটা থর থর করে ওঠে। ডাগর কাজল কালো চোখ দুটো চক চক করে। মা

মারা যাবার পর থেকে এমন করে আর কেউ তাকে আদর করে কাছে টেনে নেয় নি।

মা বললেন, মাঝে মাঝে ওপরে এসো। আমার সঙ্গে দেখা করো। বাবা আপিস গেলেই তো ঘরে একলা।

শুক্তি মাথা নেড়ে কৃতার্থ হয়ে জবাব দিল, আসবো।

এতো ভাগ্যেব কথা। আদেশ কবলেই আসবে সে। মুখে ফুটে উঠলো এমনি একটা ভাব।

বাড়ির মেয়েব মতই শুক্তি এ বাড়িভে আসা যাওয়া করতে লাগল। মায়েব সে একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে উঠলো। মাও তাকে মেয়ের আদরে কাছে টেনে নিল। আর সমর হয়ে উঠল তার প্রকাশের পটভূমিকা। সে নিজের অগোচবে সমরের হৃদয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। শুক্তিকে বাদ দিযে সমবের কোন স্বকীয়তা রইল না। শুক্তি হয়ে উঠল তাব ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। তার জীবন মূলের সিক্ততা।

শুক্তির সেবা ভিন্ন সে স্বস্তি পায় না। মনে স্বচ্ছতা পায় না। বিশেষ করে বোগ শয্যায়।

শুক্তি তো জানতো না যে সমব চিরবোগী। সে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত। অমন সুন্দর ফুলের মাঝে যে বিষিত কীট বাসা বেঁধেছে সে জানবে কেমন করে?

বর্ষা নামতেই সমব শয্যা নিল। সারা দিন ঘুষঘুষে জ্বর। রাতে জ্বব বাড়ে। কাশি বাড়ে। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার উপক্রম। চিকিৎসার কামাই নেই। দুবেলা বড় বড় ডাক্তার আসে। নিয়মমত ওষুধ পথ্য চলে। তবু রোগের উপশম হয় না। কখনো দুদিন ভাল থাকে আবাব বাড়ে আবার কমে।

জ্বরের ঘোর কাটলেই সমর শুক্তিকে খোঁজে। শুক্তি ঘবে ঢুকলেই তার শীর্ণ বিবর্ণ মুখে হাসি ফোটে। শুক্তি ভিন্ন তাকে কেউ খাওয়াতে পারে না। মা আড়াল থেকে দেখে আর আঁচলে চোখ মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সকালের দিকটা সে ভাল থাকে। শুক্তিকে বলে কাছে বসে খবরের কাগজ কিংবা কোন গল্পের বই পড়তে। শুক্তির বিষণ্ণতা বা নির্বাপিত ভঙ্গি দেখলে বা পড়তে পড়তে কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলে সমর তাকে মিনতি করে বলে, একা তুমি অন্তত আমার আশাভঙ্গ করবে না জেনেই তোমাকে কাছে ডাকি। তোমার মাঝে প্রাণের আভাস পাই। তুমি আমাকে জাগিয়ে রাখো। তোমার শুকনো মুখ দেখলেই আমার ঘুম পাবে। আমার জ্বর বাড়বে।

শুক্তি তার হাত চেপে ধরে মনোভাব গোপন করবার চেষ্টা করে। কান্নার আবেগ রোধ করতে গিয়ে তার কাঁধ দুটো কেঁপে ওঠে। বুকটা দুলে ওঠে। তবু সে নিজেকে সংযত করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তাকে আশ্বাস দেয়। বলে, আমাকে মাপ করো। রাগ করো না।

সমরও হাসে। কিন্তু তার এই হাসিটা এমনি করুণ, তার কণ্ঠস্বর এমনি আশ্চর্য রকমের কোমল আর মিনতি করবার ধরণটা এমনি মধুর যে শুক্তির চোখ ফেটে জল আসে।

কিন্তু তাকে চোখের জল লুকিয়ে হাসতে হয়। তাকে জাগাতে এসে নিজে ঘুমিয়ে গেলে চলবে কেন?

বাড়ির পরিজন রুগ্ন সমরের কাছে শুক্তির গুরুতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। বিশেষ করে মা। মেয়েটা ওকে বাঁচাতে না পারলেও ওর রোগযন্ত্রণার লাঘব করতে পারে। ওর ক্লিষ্ট মনে শান্তি দিতে পারে। কে বলতে পারে মনের এই অপার শান্তিই হয়তো তাকে নিরাময় করে তুলবে। তাকে রোগমুক্ত করে দেবে।

মায়ের মনের আশা আশ্বাস এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে। যদি পারে ঐ পারবে।

শুক্তিও আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। নিজের ভিতরে সে একটা অন্ধ অচেতন অথচ তীব্র জীবনস্রোত অনুভব করে। একটা নতুনতর যন্ত্রণার মত। যে যন্ত্রণায় জীবনের স্বাদ আছে। যে ব্যথার মাঝে

আনন্দ আছে। সমর তাকে ধরে রেখেছে। এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। মুক্ত হবার বাসনাও বুঝি তার নেই। সমরের চোখে তার দাম বেড়েছে। মার কাছে সে দামি হয়ে উঠেছে। শুধু সমরকে নয়, বাড়ির পরিজনদের পর্যন্ত সে জয় করে নিয়েছে। সে জয়ের গৌরব করতে পারে বই কি শুক্তি। এ তার জীবনের চরম জয়। পরম সার্থকতা। সে তার অকুণ্ঠ সেবা দিয়ে, মায়া, মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে সমরের চারিপাশে একটি স্বর্গ রচনা করেছে। সমর যেন তার হাত ধরে তাকে উধাও করে নিয়ে চলেছে এক অজানা অলক্ষ্য তীথপথের ঘাটে।

সমর রুগ্ন দুর্বল। তার সুন্দর মুখ জুড়ে একটি অতৃপ্তির করুণ ছায়া। চারিপাশে তার ভোগের এত উপকরণ তবু সে ভোগ করতে পেল না। তার বুঝতে বাকি নেই যে সমর ভালোবাসার ভিখারী। স্নেহ-মমতার কাঙাল। মাঝে মাঝে তার চোখের দৃষ্টিতে যে-প্রশ্ন আকুল হয়ে ফুটে ওঠে, তার বহ্নিদীপ্তি যেন শুক্তিকে পোড়াতে থাকে। কী যেন সে বলতে চায়। বলতে পারে না। তার কোমল মধুময় দৃষ্টির আন্তরিকতায় সে শিউরে ওঠে। সে হাসির প্রলেপ দিয়ে তার সেই ভয়াবহ দৃষ্টিকে ঢেকে দিতে চায়। হাসির অতলে তারও চোখদুটি প্রশ্নময় হয়ে ওঠে। সে হৃদয়কে মুক্ত করে দেয়। চোখের নীরব ভাষায় সে তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে তাকে অদেয় তার কিছু নেই। সমবের চোখ দুটি হঠাৎ জ্বলে উঠে মন্থর হয়ে আসে। সে তার হাতদুখানি চেপে ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার মুখপানে চেয়ে থাকে। চোখে ফেরাতে পারে না। তার দৃষ্টিতে এমনি একটা সুদূর তন্ময়তা আছে যে তার চোখে চোখে রাখা শুক্তির পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে। তার দৃষ্টির মাঝে অন্য এক রহস্যময় জগতের আভাস পাওয়া যায়। হৃদয়ের রহস্য তন্ত্রীগুলো ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলানো দায় হয়। তার মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে আর এক জগতে চলে এসেছে। যেখানে সমর তার জীবনের প্রভু।

বর্ষার অশ্রুফেলা শেষ হলো। শুভ্রতা আর স্বচ্ছতা নিয়ে শরৎ এলো। শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। হাসি ফুটল তার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে। মা কিছুটা স্বস্তি পেল। পরিজনদের অবসন্ন অবনমিত ভাবটা অপসারিত হলো। শুক্তি আনন্দে দুলে উঠলো। তার সেবায় নাকি সমর সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাই সে আনন্দ, গৌরবের চোখের জলে ধোয়া। আনন্দের সঙ্গে অশ্রুর উচ্ছ্বাস। মুখে হাসি চোখে জল। শরতের আকাশে বৃষ্টি ভেজা রোদের মত। সমরের মাঝে তার সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব। নিজের স্বাধীন সত্তা গেছে বিলুপ্ত হয়ে।

পিঠের উপর আলতো হাত দিয়ে মা তাকে চোখের ইশারায় ডাক দিল। শুক্তি নিঃশব্দে মাকে অনুসরণ করে চলল। জলের তোড়ে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মত। ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠল মায়ের ঘরে।

মা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার হাত ধরে কাছে টেনে নিল। অস্ফুটস্বরে বললে, বোস। তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

পরামর্শ? তার সঙ্গে পরামর্শ? হঠাৎ তার এত দাম বেড়ে গেল কেমন করে? শুক্তির বুকের তলাটা দুলে উঠলো। মায়ের মুখের অটল গাম্ভীর্যে কিন্তু সে ভয় পেল।

মা তাকে পাশে বসিয়ে নিঃশব্দে তার মাথার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার ঠোঁট দুখানি কাঁপছে। কি যেন বলবার জন্য ভিতরে ছটফট করছে। গুরুতর, সঙ্গীন কিছু নিশ্চয়ই।

মা-র মুখ গাম্ভীর্যে থম-থম করছে।

শুক্তি কাদ-কাঁদ মুখে অপরাধীর মত প্রশ্নভরা চোখে মার গম্ভীর মুখের পানে তাকাল।

মা দু'তিনটা ঢোঁক গিলে কম্পিত গলায় বললে, সমরের কথা বলছিলুম। ওকে নিয়ে আমরা সমুদ্রতীরে যাচ্ছি। ডাক্তারের নির্দেশে অবিশ্যি। সারা শীতটা সেখানে থাকবো।

মা হঠাৎ তার হাতদুখানি চেপে ধরে কেঁপে উঠলো। বললে, সমুদ্রতীরে ভারি সুন্দর শহব।

অবাক হয়ে সে মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইলো। একাগ্র হয়ে তার কথায় মনোযোগ দিল। তার মনে হলো এ যেন জীবনের অতী- কোন অদৃশ্য লোকের এক ভয়াবহ সঙ্কেত। তাব গভীর অন্তরে গিয়ে আঘাত করছে সেই অশুভ সঙ্কেত।

মা আমতা আমতা কবে ঝাপসা গলায় বললে, সমর সেখানে তোমাকে কাছে পেতে চায়। তুমি তার কাছে আছ এইটুকু সে অনুভব কবতে চায়। তোমাব সঙ্গ, তোমার সাহচর্য তাকে আনন্দ দেয়। আমারো মনে হয় তুমি তাব শুভানুধ্যায়ী, তোমাব সঙ্গ তার জীবনেব পক্ষে অশেষ কল্যাণকব। তুমি যাবে আমাদেব সঙ্গে ?

শুক্তিব মুখখানা বাঙা হযে উঠল। সে মাটির পানে চেয়ে বললে, তোমবা যদি পছন্দ ক-, আমি যাবো মা।

দুজনেই চুপ কবল। এবপব মা যে কি বলবে, কী যে বলা উচিত বুঝে উঠল না। রুদ্ধশ্বাসে বসে বসে শুক্তির মুখের উপর থেকে ভাসা চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে লাগল। মনেব মাঝে যে কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে মুখে সেগুলো বলা কঠিন হয়ে ওঠে। হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা সত্ত্বেও স্বপ্নেব ঘোরে মানুষ যেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে মায়েব অবস্থাটা সেই বকমেব। বলবাব জন্য মনেব মাঝে ছটফট করছে অথচ মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পবে মা যেন শক্তি সঞ্চয় কবে তার মুখেব পানে তাকাল। শুক্তিব চোখে চোখ বেখে অদ্ভুত কোমল স্বরে বললে, তুমি বুদ্ধিমতী। তোমার বোঝবাব বয়েস হয়েছে। তোমাকে খোলাখুলি বলাই ভাল। হয়তো সমরকে আমরা আর বেশীদিন ধবে রাখতে পারবো না। তাই তার কোন ইচ্ছাকেই আমবা অপূর্ণ রাখতে চাই না।

শুক্তির বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠল। এ কথা তো তার মনে উঁকি মারে নি। সে মায়ের হাত দুখানা শক্ত করে চেপে ধরে আর্তস্বরে

বললে, ও কথা বলো না মা। ও নিশ্চয় সেবে উঠবে। বেশ তো ভাল আছে এখন। ও কথা ভেবে মন খাবাপ কবো না তুমি।

অর্ধসচেতন অর্ধস্ফুট স্ববে মা বললে, তুই যদি পাবিস তো দেখ। আমি পাবছি না। তোর মাঝে ও সান্ত্বনা পায়। তোকে দেখলে ও রোগযন্ত্রণা ভুলে যায়। হয়তো, হযতো, তোকে ও ভালোবাসে।

শুক্তির মাথাটি মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল। মুখখানা আবো বাঙা হযে উঠল।

মা ক্ষিপ্রহাতে তার মুখখানি তুলে ধবে বললে, আমি জানি না। আমাকে কিছু বলেনি। তুমি জানো? তোমাকে বলেছে কিছু?

মাযেব উদ্বেগ-ভবা আকুল কণ্ঠস্ববে সে সমস্ত শবীবে একটা শিহবণ অনুভব কবল। বিদ্যুৎ চকিত দৃষ্টিতে মাযেব মুখপানে চেযে সে উত্তব দিল, ও বকম কোনকথা আমাকে তো বলেনি মা। তবে, আমাকে ও পছন্দ কবে। আমাব সেবা আমি কাছে থাকি, গল্প কবি,...এই পর্যন্ত।

মা দৈবাৎ তাকে কাছে টেনে নিযে উর্দ্ধশ্বাস ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আর তুমি? তোমাবো কি ঐ পর্যন্ত?

একটা ঝড়ের দাপটে শুক্তি ধবাশাযী হয়ে গেল। ছোট পাখিব মত ছটফট কবতে কবতে সে মাযেব বুকেব উপব লুটিযে পডল। মা তাকে দুহাতে বুকেব মাঝে চেপে ধবল। মায়েব বুকে মুখ লুকিয়ে শুক্তি অঝোবে কাঁদতে লাগল।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্ববে বললে, আমি এই ভযই কবেছিলুম, মা। ভুল আমারি।

মাযেব চোখ দুটি জলে ভবে এলো। বাষ্পাদ্র কণ্ঠে বললে, এব পব আব আমাদেব সঙ্গে তোমাব যাওযাব প্রশ্ন ওঠে না। ছেলের মুখ চে। তোমাকে আমি হত্যা কবতে পাববো না। এ আঘাতের হাত থেকে তুমি বাঁচবে কেমন কবে?

অশ্রুসিক্ত কাতর অসহায় চোখে শুক্তি মুখ তুলে মা'ব পানে

তাকাল। ভয়ে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে হঠাৎ মাটিতে বসে মায়ের পা দুটো চেপে ধরে মরনোন্মুখ ভয়ার্ত কণ্ঠে বললে, তোমার পায়ে পড়ি ও কথা বলো না মা। আমায় ফেলে যেয়োনা। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। ও-ও পারবে না আমাকে ছেড়ে থাকতে। ওর সেবার জন্যে আমাকে ওর একান্ত প্রয়োজন।

মা বিব্রত হয়ে তাকে মাটি থেকে হাত ধরে তুলে নিল।

শুক্তি কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমাকে বাঁচাবার জন্যে ওর মনে আঘাত দিও না মা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও নিজেকে বাঁচাতে পারলুম না।

—আমি জানি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু কী সঙ্কটেই আমায় ফেললে!

আমি জানতুম আমি ওকে কোনদিন পাবো না। আমি ওর উপযুক্ত নই। কিন্তু তবু আমি ওকে না ভালোবেসে পারলুম না। ও আমাকে জয় করে নিল।

মা নিঃশব্দে শুক্তিকে হৃদয়েব মধ্যে টেনে নিল। তারো দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। তারো নিজেকে একান্ত অসহায় মনে হলো।

শুক্তি তার বুকে মুখ লুকিয়ে বললে, এ কথা কারুকে জানাবো না ভেবেছিলুম মা। আমি তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি, ওকেও কোনদিন এ কথা জানাবো না।

মা বললে, না, না। শপথ কববার দরকার নেই মা। ও যদি জানতে চায়, যদি জেনে সুখি হয় তাকে জানিয়ো। আমরা ওকে সর্বদিক দিয়ে সুখি করতেই চাই। তুমি ওকে ভালোবাস জেনে যদি একটি দিনও সুখি হয়, ওকে জানিয়ো।

হঠাৎ তাকে বুকের মাঝে নিষ্পেষিত করে মা বুকভাঙা আর্তস্বরে বলে উঠলো, কিন্তু মা, তোমার সার হবে অরণ্যে রোদন। তোমার গতি কি হবে?

—অদৃষ্টকে মানা ভিন্ন গতি কি মা? আমি ওর সেবা করতে

পেলেই সুখি। আমার কথা ভেবো না। তোমার আশীর্বাদ ওকে নিরাময় করে তুলবে।

শুক্তি নত হয়ে মাকে প্রণাম করল।

মা তাকে চুম্বন করে বললে, তোমার ভালোবাসা ওকে নিরাময় ও সুস্থ করে তুলুক। তুমি সাবিত্রীর মত যমজয়ী হও।

শুক্তি জ্বলে উঠেছে। দেদীপ্যমান শিখার মত তার রূপের আভায় ঘরখানা ভরে উঠেছে। ললাটে শান্তশ্রী, অধরে মধুর হাসি। হাতে এক গোছা ফুল নিয়ে সে সমরের বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। একখানি কচিকলাপাতা রঙের লালপাড় শাড়িতে তাকে অপরূপ মানিয়েছে। মাথার চুলগুলি পরিপাটি বিন্যস্ত। হাতে দুগাছি করে সোনার চুড়ি। কমনীয় কণ্ঠে একটু সরু হার চিকচিক করছে। সমর দুচোখ ভরে তাকে দেখল। মুখে ফুটে উঠলো প্রসন্ন হাসি। প্রশ্ন করল, হঠাৎ?

—কি?

—নিজেকে এমন ঘষে মেজে চকচকে করে তুলেছো যে?

সলজ্জ ভঙ্গিতে সামনের বড় আর্শিতে নিজের প্রতিবিম্বের পানে চেয়ে সে হাসতে হাসতে বললে, মা চুল বেঁধে দিয়েছে! মায়ের সঙ্গে বাজার করতে যেতে হবে। বাইরে যাবার জুতো জামা কিনতে।

সমরের মুখখানা কালো হয়ে গেল। মুখ ভারি করে বললে, এখানে আসবার কি দরকার ছিল? চোখে যা ভাল লাগে তা যদি দুদণ্ড চোখ ভরে দেখবার জো আছে?

শুক্তির মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠলো। সে ফুলগুলো একটা ভাসে সাজিয়ে দিতে দিতে মুখ ঘুরিয়ে বললে, তুমি দেখো না। তোমাকে দেখতে কে মানা করছে?

সমর ছেলেমানুষের মত ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তারপানে চেয়ে বললে,

কতোক্ষণ আর দেখবো? তোমার সময় কোথায়? এক্ষুণি তো চলে যাবে?

—এখুনি নয়। দেরি আছে। মায়ের সারা হতে এখনো অনেক দেরি। আমারো অনেক কাজ বাকি।

সমবের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি হাসির মৃদুরেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সমর বললে, ঐ জরদা গোলাপের কুঁড়িটা আমায় দাও তো।

শুক্তি ফুলের কুঁড়িটা আর থার্মোমিটারটা হাতে নিয়ে তার পাশে এসে বসল। সমর কুঁড়িটা তার খোঁপার খাঁজে পবিয়ে দিল। শুক্তি কাত হয়ে আর্শিতে খোঁপার ফুলটা দেখতে দেখতে বললে, সুন্দর ফুলটা।

খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে সমর বললে, সুন্দর চুলটা।

তির্যক ভঙ্গিতে শুক্তি তার পানে চাইল।

সমব বললে, ছবির সৌন্দর্য তার পটভূমিতে। অমন সুন্দর খোঁপার পটভূমি না পেলে ফুলটা অমন জ্বলে উঠতো না।

কৌমার্যের মধুব সঙ্কোচে শুক্তিব কালো চোখের দীর্ঘ পল্লবগুলি জড়িয়ে এলো।

সমরের মুখ থেকে থারমোমিটাবটা বের কবে নিয়ে উল্লাসের কণ্ঠে শুক্তি ঘোষণা করে, নাইন্টি সেভেন। বলিনি, আর জ্বব আসবে না।

শুক্তি তার গেঞ্জিব ভিতব হাত ভরিয়ে বুকের উপর হাত রেখে বলে, আঃ! গা ঠাণ্ডা হিম। তোমার বড় খুঁতখুঁতে স্বভাব। জ্বরের কথা ভেবে ভেবে জ্বরকে ডেকে আনো।

সমর শুক্তির হাতখানি নিজের শীর্ণ হাত দিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে গভীর আরামে বলে, আসুক না জ্বব। জ্বরকে কে তোয়াক্কা করে? তুমি কাছে থাকলে জ্বর কখন আসে কখন যায় বুঝতেও পারি না। জ্বর আমাব গা-সওয়া হয়ে গেছে। তুমি কিন্তু আমার চোখ সওয়া হলে না।

—কেন?

নিরীহ শূন্য দৃষ্টিতে শুক্তি তার রোগপাণ্ডুর মুখের পানে তাকাল!

সমর তার একখানা হাত চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললে, চোখ-সওয়া হলে আমার মনের কথা বুঝতে তোমার এত দেরি লাগতো না।

কথাটা চাপা দেবার জন্যই বোধ হয় শুক্তি বললে, ট্যাবলেট্ খাবার সময় হয়েছে। ট্যাবলেটের সঙ্গে একটু হরলিক দেব তো?

—তোমার যা খুশি দাও।

—লক্ষ্মী তুমি।

স্নেহভরা বাঁকা চোখে ঝিলিক দিয়ে সে বিছানা থেকে নেমে যায়।

সমর বলে, তুমি কিন্তু ভারি দুষ্টু!

থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে শুক্তি বলে, মা কিন্তু বলেন, আমি লক্ষ্মী!

—তাই তোমার এত গুমোর।

শুক্তি চোখ পাকিয়ে চাপা গলায় সুর করে বলে, 'তোমার গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমার রূপে'।

—ইস্!

ওষুধ খাইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে শুক্তি বললে, দাঁড়াও তোমাকে একটু ফিটফাট করে দিই। জ্বরের তাপে মুখখানা ঝলসে গেছে।

পেরোক্সাইড ক্রিম মাখিয়ে মুখের ত্বকটাকে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তুলে তাতে শুক্তি পাউডারের তুলি বুলিয়ে দিল। তারপর চিরুণী দিয়ে এলোমেলো চুলগুলোকে পরিপাটি করে আঁচড়ে দিল। চিবুক ধরে চুল আঁচড়ে দিতে দিতে ঠোঁট ফুলিয়ে শুক্তি বললে, আমার চুলের কথা বলছিলে, এ চুলের কাছে আবার আমার চুল?

শুক্তির সেবা যত্নের এই সুনিবিড় স্পর্শ সমরের গায়ে রোমাঞ্চ জাগায়। সে স্তব্ধবিস্ময়ে তার হাতখানি নিজের মুঠোর ভিতর চেপে ধরে স্থির হয়ে বসে রইল। তার ঠোঁট দুটি মুহূর্ত কেঁপে উঠেই থেমে গেল। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারলে না।

শুক্তি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, কি বলবে বলো না।

সমর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বললে, বলবো? রাগ করবে না তো?

—ভারি দুষ্টু! আমার রাগকে তুমি ভয় করো নাকি? বলো কি বলছিলে।

সমর গাঢ় কম্পিত স্বরে বললে, যদি আমি সেরে উঠি শুক্তি—

শুক্তি বাধা দিয়ে বললে, 'যদি' বলছো কেন। বলো 'যখন'... তুমি তো অনেক ভাল আছ।

—বেশ। তখন তুমি কি আমাব হবে?

তার ঝাপসা গলায় প্রার্থনার সুর। সে সুরের ঝঙ্কারে শুক্তির কুমারী হৃদয়ে একটা কাঁপন ধবলো। আনন্দে তার মন কাঁপে। উল্লাসে যেন আকাশ বাতাস উদ্দাম উতরোল হয়ে ওঠে। তারুণ্যের এই আবেদন, আত্মসমর্পণের এই আকুল আমন্ত্রণ তাকে বিব্রত ও অস্থির করে তুলল। সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে ধীব শান্ত গলায় উত্তর দিল, আমি কি তোমার যুগ্যি?

সমর তার কাঁধে একখানি হাত রেখে ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, আমিও তো মানুষ নই। মানুষের ছায়া। তুমি ভুলে যাও ও-কথা। আমি ভুলবো আমি রুগ্ন। নিজেদেব ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে দুয়ে মিলে পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করবো।...আমাদের পরমায়ুর মত পৃথিবীর পরমায়ু ও অনন্ত নয়। প্রকৃতি অকরুণ।...

বাইরে মায়ের গলা শোনা গেল।

মা আসছে। শুক্তি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। মা আসতেই শুক্তি হাসিমুখে বলল, আর জ্বর আসে নি মা।

মা সমরের পানে চেয়ে আশ্বাসভরা গলায় বললে, না আর জ্বর আসবে না। শীতটা চেপে সুমুদ্দুরের ধারে কাটাতে পারলেই সেরে যাবে।

সমরের কপালে হাত রেখে মা বললে, না, গা বেশ ঠাণ্ডা।

সমর মায়ের হাতখানা বুকে চেপে ধরে স্নিগ্ধ গলায় বললে, শুক্তিকে নিয়ে কোথায় চললে মা ?

মা শুক্তির পানে চেয়ে বললে, সামনের রবিবারে আমাদের যাওয়া। ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে। ওর বাবাকে বলে রাজি করেছি। তাই ওর কিছু জামা কাপড় কিনে দিতে হবে তো।

—শীতের জামা কাপড় কি এখানে পাবে ?

—না সে সব কলকাতা থেকে আনিয়ে নেব।

॥ তিন ॥

সমুদ্রতীরের অক্‌সিজেন সিক্ত অম্লান বায়ু আর শরতের ঝলমলে রোদ সমরকে অনেকটা সুস্থ করে তুলল। সমুদ্র সৈকতে মস্ত বড় পাথরের বাড়ি। শুক্তির সঙ্গে সে বালির উপর ঘোরাফেরা করে। বারান্দায় বসে শুক্তি তাকে আগের মত খবরের কাগজ কিংবা হালকা গল্প উপন্যাস পড়ে শোনায়। হাসি গল্পে গানে শুক্তি তাকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। শুক্তিই তার জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। শুক্তিই তার মাকে সঞ্চারিত করে জীবনী শক্তি।

কথা তাদের ফুরিয়ে যায়। দুজনে নিঃশব্দে পরস্পরের পানে চেয়ে থাকে। চোখোচোখি হলেই তাবা হেসে ফেলে। ভরা যৌবনের লজ্জানম্র হাসি। সেই হাসির মাঝেই শাশ্বত প্রেমের প্রতিশ্রুতি। সামনে আকাশ আর অনন্ত সমুদ্র যেমন মিলে মিশে এক হয়ে আছে মনে গয় তেমনি তাদের দুটিকে পাশাপাশি দেখলেই মনে হবে এক জোড়া সুখি প্রণয়ী। কিন্তু মিলন কোথায়? দিগন্তের মাঝে শূন্যতার সর্বগ্রাসী অতল গহ্বরের মত তাদের মাঝেও অতল শূন্যতা। এত কাছাকাছি তবু তাদের মাঝে পাথরের নিরেট পাঁচিল তোলা। শুক্তিকে সহচরী ও হিতৈষিণী রূপে কাছে পেয়ে সমর এতোদিন সন্তুষ্ট ও সুখি ছিল। তার স্নেহ, প্রীতিও সেবা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাথা তুলতে দেয়নি। আসলে তখন ক্ষায়মান দেহের রক্তস্রোতের ছন্দ ছিল স্তিমিত। কামনা-বিরহিত। কিন্তু এখন তার মাঝে একটা পরিবর্তন সুরু হয়েছে। তার দেহের শিরায় আবার যৌবনের দুরন্ত, রক্তের জোয়ার এসেছে। কামনা লালসার প্রচণ্ড একটা আলোড়ন তাকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে। শুক্তির পানে চেয়ে চেয়ে সে নিজের ভিতর একটা সুস্পষ্ট বেদনা অনুভব করে। সে এক

অনির্বচনীয় আনন্দময় বেদনা। স্বপ্নে, সত্যে মেশানো সে এক অবর্ণনীয় অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা।

একদিন নিবালা সমুদ্র সৈকতে বসে সমর শুক্তিকে বলল, দেখো শুক্তি, যেদিন এসেছে সেদিন হয়তো আর না আসতেও পারে।

—যতো বাজে কথা।

শুক্তি চোখে ঝিলিক দিয়ে তাকে শাসালো। সমর বললে, তাব জন্যে আমার কোন দুঃখ্যু নেই। যে জীবন আমি কাটাচ্ছি সেটা নিশ্চয়ই সুখের নয়।

একটু থেমে হঠাৎ সে শুক্তিব একখানা হাত ধরে ভিজে গলায় বললে, সময় যখন পেয়েছি মুখোমুখি জীবনকে প্রত্যক্ষ করাই সমীচীন নয় কি?

সংশয় বিচলিত শুক্তি সশঙ্ক দৃষ্টি তুলে তার মুখেব পানে তাকাল।

সমব বললে, প্রেমেব পৃথিবীতে এসে আসল প্রেমের স্বাদ না জেনেই ফিরে যাবো?

আরক্ত মুখে কম্পিত কণ্ঠে শুক্তি বললে, কেন, আমরা তো দুজনে দুজনকে ভালোবাসি।

—ভালোবাসি বলেই তো বলছি। চলবাব শক্তি থাকতে থাকতে চরম বিলুপ্তিব পূর্বেই প্রেমেব তীর্থঘাটে পৌঁছুতে চাই। মাঝপথ থেকে ফিবতে চাই না। ফিবতে পাববো না। যাত্রাশেষ করে আমি সমাপ্তিতে পৌঁছুতে চাই।

বিভ্রান্তেব মত প্রথমটা হতচকিত দৃষ্টিতে শুক্তি তাব মুখের পানে তাকাল। তারপর মাথা নিচু কবে গাঢ়স্বরে বললে, আমি তো তোমার হাত ধবেই আছি। আমি তো আগেই নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি তোমার সেবায়। আমাকে আদেশ করো।

চমকে গেল সমর তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তায়। তার অনমনীয় কণ্ঠস্বরে। সহসা তার কথার জবাব দিতে পারল না।

শুক্তি বললে, আমরা তো দুজনে দুজনকে পেয়েছি। এতো ভালবাসা—

বাধা দিয়ে সমর বলে উঠলো, পেয়েছি। মনে পেয়েছি। হৃদয়ে পেয়েছি। সত্তায় সত্তায় দুয়ে মিলে এক হয়ে গেছি। পাইনি শুধু দেহে। পাইনি শুধু ভোগে। আমরা তো তপস্বী নই। প্রেমের জন্য তপস্যা করে কামজয়ী হতে চাইনি। কিন্তু—

—কি ?

উৎসুক দৃষ্টি তুলে তাকাল শুক্তি।

—তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই আমি এগোতে পারি না শুক্তি। আমি তোমাকে আমার জীবনের চেয়ে ভালোবাসি।

—সেই ভালোবাসাই আমার জীবনেব পথকে আলোয় আলোয় ভরে দেবে। তুমি আমায় নাও।

শুক্তি তার হাতদুখানি নিজেব উন্নত বক্ষচূড়ায় চেপে ধরল।

আচম্বিতে তাদের পায়ের তলায় একটা সফেন তরঙ্গ এসে লুটিয়ে পড়ল। তারা জড়াজড়ি করে দৌড়তে দৌড়তে উপরে উঠে গেল।

শুক্তি মাকে জানাতে চেয়েছিল। সমর তাকে অবকাশ দিল না। তার ছেলেমানুষী বায়না। চোখ বুঁজে সেই রাত্রেই শুক্তিকে আহুতি দিতে হলো সমরেব কামনানলে।

সমর তাকে বোঝালো, বিয়ে সত্য হয় প্রেমে। আমাদের প্রেম সত্য। প্রেমের মন্ত্রে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক আগেই। লোক জানাবার জন্যে অনুষ্ঠান। পবে হলেও ক্ষতি নেই।

সমর তাকে গভীর তৃপ্তিতে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বন করে বললে, শুনছো। বাইরে সমুদ্র আমাদের মিলনের বাঁশী বাজাচ্ছে। চেয়ে দেখো আকাশে চাঁদের দৌরাত্ম্য। আকাশকে যেন চষে ফেলছে।

এই তো জীবনের আসল রূপ। এই মিলিত জীবন। এই মিলনের মাঝেই সৃষ্টির পরম রহস্য সঙ্গোপন।

শুক্তি চোখ খুলে তার মুখের পানে চাইতে পারে না। নম্র লজ্জায় চোখ বোজে। সমরকে সুখি করা ছাড়া তার জীবনে আর কাম্য কিছু নেই। সেই তার জীবনের পরমার্থ। সেই তার ধর্ম। ধর্ম ভেবেই সে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল। দ্বিধা করল না।...

পরের দিন সকালে শুক্তি অপরাধীর মত মাকে সব কথা বলল। মা প্রথমটা স্তম্ভিতের মত নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। নিদারুণ শঙ্কার একটা পাণ্ডুর ছায়ায় তার মুখখানা ভরে গেল। মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখের পানে চেয়ে শুক্তিব অন্তরটা আতঙ্কে শিউরে উঠলো। সে মরণোন্মুখ ভঙ্গিতে মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে গুমরে কেঁদে উঠলো।

মা তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল। তার মুখে কথা ফুটল না। ফোঁটায় ফোঁটায় তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে শুক্তির আলুথালু চুলগুলোকে ভিজিয়ে দিল।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। দুজনেই নির্বাক হয়ে গেছে। কথা ফুরিয়ে গেছে। বলবার কিছু নেই।

মা বলবে কি? অপরাধের ভারে তার দীর্ণ হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে অপরাধী। এই নিষ্পাপ ফুলের মত মেয়েটির কাছে সে চির অপরাধী। ধর্মেব চোখে সে পাপী। এ পাপ থেকে সে মুক্ত হবে কেমন করে? একটা ফুলন্ত মেয়েব জীবনমরণের কথা। মা ভুলে গেছে নিজের ছেলেব কথা। তার বক্ষলগ্ন এই নিরুপায় মেয়েটিই তার মনে পাহাড়-প্রমান হয়ে উঠেছে। এর কল্যাণ চিন্তায় তার হৃদয় দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একে বাঁচাবে কেমন করে?

সে মা। এই কি মায়ের আকল্প নাকি? নিজের সন্তানের কল্যাণে পরের সন্তানের সর্বনাশ সাধন করা। লোকে বলবে কি? মুখ তুলে সংসারের পানে সে চাইবে কেমন করে? নিজের উপর তার ধিক্কার হয়। নিজের বিরুদ্ধে নিজে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।....

মেয়েটাকে কদিন একটু চোখে চোখে রেখে অঘ্রানের এক শুভদিনে বিশেষ বিবাহ আইন মতে রেজেষ্টারী করে সমরের সঙ্গে শুক্তির বিয়ে দিল। তারপর দুজনকে একটা কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে শুক্তিকে মন্ত্রপূত শাঁখা সিঁদূর পরিয়ে বরকনেকে বাড়ি নিয়ে এলো।

শুক্তি জ্বলে উঠেছে। তার মুখে চোখে বিজয় গৌরবের উল্লাস। ওর ললাটের দীর্ঘ সিঁদুরের রেখা আগুনের শিখার মত লকলক করছে। সমরের তারুণ্যও যেন তার সর্বাঙ্গে দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে। তার কালিমা ভরা কালো চোখে আদিম পৌরুষ যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ও যে কী চোখে শুক্তিকে দেখেছে নিজেই আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি। ওকে দেখে ওর তৃপ্তি নেই। সারাক্ষণই ভাবাবিষ্টের মত ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাবপানে চেয়ে চেয়ে দেখে। তার সুখের জন্য যেন ওর মনে সদাই একটা নারীসুলভ উদ্বেগ।

মা'র চোখ জুড়িয়ে যায় তাদের দুটিকে একসঙ্গে দেখে। এক জোড়া আদর্শ-তরুণ দম্পতি বলেই মনে হয়। কিন্তু তাদের নিকট ভবিষ্যতের কথা মনে হলেই মায়ের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। মনে হয় এ ক্ষণিকের স্বপ্ন। শুক্তির শিঁথিভরা সিঁদুবের পানে চেয়ে তার মনে হয় ও রক্তিমাভা ক্ষণস্থায়ী। সূর্যের শেষ রক্তরশ্মির মত চোখ জ্বলিয়ে দিয়ে আবাব ধূসর মেঘের কোলে মিলিয়ে যাবে। আধফোটা কলি পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই ঝরে যাবে। আর ওর অদৃষ্টের জন্য তাকে দায়ি থাকতে হবে আজীবন। ওর জীবনের ব্যর্থতাব জন্য ওর দুর্ভাগ্যের জন্য ওর প্রতিটি নিশ্বাসের জন্য নিঃসন্দেহ তাকে জবাবদিহি করতে হবে এই চিন্তা মার কাছে একটা দুঃসহ যন্ত্রণার মত। তার জন্য ভিতরে ভিতরে সে সদাই সশঙ্কিত। সঙ্কুচিত।

এই ক'টি দিনে মেয়েটাকে সে কি ভালোই বেসেছে। ভালো বেসেছে নয়। ও মুগ্ধ। তাকে দেখে ও আশ্চর্য হয়ে যায়। তার অঙ্গের লালিত্যে, তার চলাফেরায়, তার শিষ্ট শান্ত ব্যবহারে সে সম্মোহিত। তার প্রেমের ঐকান্তিকতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে প্রশংসা

না করে উপায় নেই। তার সূক্ষ্ম টানা ভুরুর নিচে নির্ভীক চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হয় সে জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে নেমেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনের কোন প্রান্তে তার ভয় ভাবনার লেশ মাত্র নেই। ও তো সব জেনে শুনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। কোন কথা তো ওর কাছে গোপন নেই।

ক্ষণভোগ্য হলেও ওদের দাম্পত্য অবিস্মরণীয়। জীবনকে তারা উদ্দাম ভাবে অভিনন্দিত করল। আকণ্ঠ পান করল তারা জীবনের হলাহল। যৌবনের অমৃত। হয়তো বা অপরিমিত ভোগ-বিলাসের দাপটে সমরের ঘুণধরা দেহ ভেঙ্গে পড়ল ক্ষিপ্রগতিতে। রোগক্লিষ্ট কৃশ দেহ সইতে পারবে কেন তারুণ্যের এ রোমাঞ্চ, এ উত্তেজনা!

শীত কেটে যেতেই সমরেব আবার শরীব ভেঙ্গে পড়ল। মা প্রমাদ গণল। এদিকে মায়ের চোখে ধরা পড়ল শুক্তি অন্তর্বত্না। সমরের সন্তানের জননী হতে চলেছে সে। আনন্দের ও অশ্রুর বাষ্পে মায়ের বুক ফুলে ফেঁপে উঠল। হর্ষ ও বিষাদে তার মনের ভিতরটা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

নতুন অতিথি আসছে। বংশের উত্তর সাধক। আনন্দের দিন বই কি। তবু কেন একটা আতঙ্কেব আভাসে বুক কেঁপে ওঠে।

শুক্তি আর সমর দুজনে মুখোমুখি বসে নিঃশব্দে হাসে। হাসে তারা সৃষ্টির আনন্দে। দুর্বোধ্য অদ্ভুত হাসি। এ যে তাদের কাছে সত্যই বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এ সম্ভাবনা যে তাদের জীবনে ছিল তারা কল্পনা করবে কেমন করে। বুঝবে কেমন করে যে তারা স্রষ্টাব প্রতিনিধি। তাদের মিলনে হবে মহামানবের সৃষ্টি!

তাই তারা সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা।

মানুষ কিছুতেই আশা এবং বিশ্বাস হারাতে চায় না। মায়ের মনে ও কেমন দৃঢ়মুল বিশ্বাস জন্মেছে যে সমর ভাল হবে। শুক্তি সাধারণ

নয়। সামান্য নয়। তার অকপট আন্তরিক প্রেম তার স্বামীকে নীরোগ করে তুলবে।

মা তাকে আদরে যত্নে ডুবিয়ে রাখে। তাকে ঘোরালো করে সিঁদুর আলতা গয়নাগাঁটি পরিয়ে সর্বক্ষণ সাজিয়ে রাখে। তাকে অবলম্বন করে মা বৃহৎ আনন্দময় জীবনের স্বপ্ন দেখে।

মাটির তলার অঙ্কুরিত বীজের মত কি যেন উন্মুক্ত ও বিকশিত হয়ে শুক্তির শরীর জুড়ে খেলা করতে থাকে। তার ভিতর থেকে প্রবাহিত হয় রহস্যময় বেদনা বিজড়িত এক আনন্দ ধারা। তাকে যেন নতুন জীবনে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে। যত দিন যায় তাব বুক দুটো যেন নতুন রসসঞ্চাবে পূর্ণ হয়ে ওঠে মনে হয়। নিজের ভিতর সে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য অনুভব করে। সে এক বিস্ময়কব অনুভূতি। পুরুষের প্রথম স্পর্শের চেয়েও রোমাঞ্চকর। প্রেমেব চেয়ে তপ্ত ও তীব্র।

মা সদাই সজাগ ও সচেতন। নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে তার নির্দেশ মানতে মানতে শুক্তি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা অনুষ্ঠান।

সমর মুখ টিপে হাসে।

শুক্তি চোখে ঝিলিক দিয়ে তাকে শাসায়। তোমাদের কি? হাসবে বৈ কি।

সমর বলে, ছেলে হলে কি নাম রাখবে বলতো?

সমর তাকে কাছে টেনে নেয়।

শুক্তি আঁতকে ওঠে, আবার জ্বর এসেছে যে গো!....

অবিরাম জ্বর। জরের বিরাম নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাশি বাড়ে। একদিন কাশতে কাশতে কস্ গড়িয়ে রক্ত দেখা দিল। মা প্রমাদ গনল।

আধমরা সমরকে নিয়ে গাড়ি রিজার্ভ করে তারা কলকাতা ফিরে এলো।

পুরাণের সাবিত্রীর মত শুক্তি মৃত্যুর সঙ্গে বুক ফুলিয়ে সংগ্রাম করল। যমের পথ আগলে দাঁড়াল। কিন্তু আধুনিক যমের শেভালৃরি

কম। সতীত্বের সংজ্ঞাও আলাদা। তিনি আদালতের পেয়াদার মত স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পরোয়ানা জারি করেন।

সমর নীরবে জীবনের দেশ থেকে সরে গেল। শোকার্ত জননী ও গর্ভিনী পত্নী হাহাকার করে উঠলো।

শোকশয্যা ছেড়ে মা আর উঠলো না।

সমরের অশৌচান্তের পূর্বেই নিঃশব্দে ঘুমের মাঝে একদিন মহাঘুমে অচেতন হয়ে গেল। দুর্ভাগ্য যেন শুক্তিকে পিষে মারতে চায়। সে তারি প্রতীক্ষায় চোখ বোঁজে।

চোখ বুঁজেই অন্ধকারে রইল কদিন!

ভুলে গিয়েছিল গর্ভের সন্তানের কথা। সেই তাকে জাগিয়ে দিল। ঠেলে তুলে দিল।

শুক্তি চোখ মেলে তাকাল।

নিশ্বাসের মাঝে শুনতে পেলে একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ। ছুরির ফলা দিয়ে তার বুক চিরে দিল সেই শানিত শব্দ। শরীরের গভীরে দাপাদাপি করছে প্রাণচঞ্চল ভ্রূণ। জানিয়ে দিচ্ছে 'আছি। আমি বেঁচে আছি।'

সব গেলেও কিছু থাকে। সব ফুরিয়ে যায়। আশা ফুরোয় না। জাদুকরী আশা শুক্তিকে জাগিয়ে তোলে। সে মা। স্বামী তাকে মাতৃত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেছে। দিয়ে গেছে মহান্ কর্তব্যের গুরুভার। সন্তানের কল্যাণের জন্য তাকে বেঁচে থাকতে হবে। স্বামীর স্মরণিককে সগৌরবে সংসারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তার ভিতরের শাশ্বত মা তাকে তুলে ধরে। সে তার স্ফীত জঠরে হাত রেখে অদৃশ্য সন্তানের স্পর্শ অনুভব করে। তার সর্বশরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। স্বপ্নের ঢেউ লাগে বাস্তবের নির্মম কাঠিন্যে।

অভাব কিছুরই রেখে যায়নি তার শাশুড়ি। স্থূল জগতে জীবন-ধারণের উপযোগী প্রচুর ব্যবস্থা করে গেছে মা ও সন্তানের জন্য। অপর্যাপ্ত স্থাবর অস্থাবর। রাজরাণীর ঐশ্বর্য।

শুক্তিকে বাঁচতে হলো। মাকে বাঁচতে হলো অনাগত সন্তানের কল্যাণে। নিজেকে তুলে ধরতে হলো। শরীরের দিকে সচেতন হতে হলো। শরীর তো তার নিজের নয়। মার শরীরে সন্তানের অবিসংবাদী অধিকার। মার বক্ষে তার প্রাণবায়ু।

দেহের মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। মাথা চাড়া দিয়ে গজিয়ে উঠছে! মার রক্তে দেহ গড়ে উঠছে। প্রতিটি অবয়ব পুষ্টি লাভ করছে। স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল সুশ্রী সুন্দর দেহ নিয়ে মায়ের বুক আলো করবে।

সেই দিন আগত। স্তব্ধীভূত প্রতীক্ষায় শুক্তি দিন গোণে।......

আর কিছুই সে ভাবতে পারে না। হতাশার ঘন অন্ধকারে ঐ একটি ক্ষীণ আশা তার চোখের সামনে শিখার মত জ্বলতে থাকে। কিন্তু নির্মম নিয়তির একটি ফুঁয়ে তাও নিভে গেল। তাঁর অমোঘ বিধানে শুক্তি অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে এক মৃতপুত্র প্রসব করল।

॥ চার ॥

শুক্তি নিমুকে জামাকাপড় পরিয়ে দিচ্ছিল। মাষ্টারের সঙ্গে সে বেড়াতে যাবে।

গজ গজ করতে করতে রাঁধুনী রমা নিমুর দুধের বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

—কেমন মানুষ গো বউদি ঐ মাস্টার! কোথাকার জংলী।

শুক্তি কোন কিছু বলবার আগেই নিমু চোখ রাঙিয়ে বলে উঠলো, ধেৎ! মাস্টার মশাই ভালো। তুমি বজ্জাত।

রমা ও শুক্তি একসঙ্গে হেসে উঠল। রমা নিচু হয়ে তার গাল টিপে দিয়ে বললে, ভাল। ভাল। আমিই বজ্জাত। মাষ্টারকে খেতে বলো। কিছু খায় না কেন?

নিমু বললে, না খায়না? আমার সঙ্গে লজেন্স খায়। চকলেট খায়।

আরেকটা হাসির ঢেউ তুলে শুক্তি রমাব পানে তাকাল: কি হয়েছে কী?

বমা মুখ ভার করে বললে, হবে আর কি? কিছু যদি ওর মুখে রোচে! কিছু যদি খেতে চায়? কড়াইশুঁটির কচুরী ভেজেছিলুম, তাই চায়ের সঙ্গে দুখানা দিতে গেলুম। একেবারে লাফিয়ে উঠল। বলে কি কুকুরের পেটে ঘি সজ্জ হবে না। ঢক ঢক করে খালি পেটে চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

শুক্তি নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে মৃদু হাসল।

রমা বললে, হাসির কথা নয় বউদি সোমত্ত বয়েস। পেটভরে না খেলে বাঁচবে কেমন করে? পাতে যা দিতে যাই তাতেই বলে, 'না'। ভাত খাওয়া যদি দেখো তো অবাক হয়ে যাবে। দু'গরাস

ভাত যদি পেটে দেয়। কেনে গা? অমন কেনে? সদাই মুখে মাটি লেপে আছে। হাসতে তো জানেই না। কথা কইতেও কি জানে না?

—তোর সঙ্গে আবার ও কি কথা কইবে?

—কেনে আমার সঙ্গে কথা কইলে কি জাত যাবে নাকি? এখানে কে আছে ওর? কথা কইবে কার সঙ্গে? কার কাছে চেয়ে খাবে? কে এখানে ওকে যত্ন আত্তি করে খাওয়াবে? মরণ দশা! উড়ে বামুন হলে ওদের ঠিক হয়। খেলি খেলি না খেলি না খেলি—

মুখে আঁচল দিয়ে শুক্তি হাসল।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ভারি গলায় ডাক এলো, নিমু কাম এলং—

নেচে উঠল নিমু। চেঁচিয়ে সারা দিল, কামিং—রেডি।

মাকে একটা তাড়াতাড়ি চুমু দিয়ে নিমু বললে, গুড্ বাই মা মনি!

—গুড্ বাই!

নাচতে নাচতে নিমু বেরিয়ে গিয়ে কল্যাণের হাত ধরল। শুক্তি আর রমা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। কল্যাণ তাদের পানে ফিরেও তাকাল না। ।নমুর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

রমা বললে, লেখাপড়া শিখলে কি হবে, লোকটা ভদ্রতা শেখেনি। তোমাকে অন্তত একটা নমস্কার করা উচিত ছিল তো—

শুক্তি বললে, ভারি লাজুক, আর বোধ হয় অনেক ঝড় ঝাপটা সইতে হয়েছে। অনেক দুখ্যু পেয়েছে।

—তোমার সঙ্গে কথা বলে না?

—আমি না বললে, বলে না। আর কি কথাই বা বলবে?

রমা অন্যমনস্কে অস্ফুটস্বরে বললে, কে জানে বাড়িতে ওর কে আছে। বিয়ে করেছে কি না—

মুখটিপে হাসতে হাসতে শুক্তি বললে, জিজ্ঞেস করিস না কেন?

রমা বোধ হয় নিজের দুর্বলতা চাপবার জন্যই গলায় জোর দিয়ে বললে, আমার কিসের মাথাব্যথা ?

তার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে শুক্তি বললে, তোমার মাথার জট ধরে টানে যে ও, তাই তোমার মাথাব্যথা।

মুখ রাঙা করে রমা বলে, কি যে বলো তুমি বউদি।

—তবে ওর জন্যে তোর এত দরদ কেন ? তোর যত্ন-করে-ভাজা কচুরী খেলে না বলে তোর বুক টনটন করে কেন ?

রমা গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বললে, মাগো ! কি বলো গো তুমি বউদি। ওর জন্যে যত্ন করে কচুরী ভাজা ? ও খেলে না বলে আমার বুক টনটন করে উঠল ?

হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে শুক্তি বললে, উঠলো না ?

—না। ওকে বুক টনটন করা বলে না। রাগ হয় না অপমান করে ফিরিয়ে দিলে ?

—হাঁ। রাগ আব অভিমান দুই-ই হয়।

রমা বললে, অভিমান কববো কার ওপর ? ও কি অভিমানের তোয়াক্কা রাখে ?

হাসতে হাসতে শুক্তি বললে, রাখেনা বলেই তো তোর এতো গায়ের জ্বালা।

রমা অধৈর্যের মতো বলে ফেললে, তা জ্বালা একটু হবে বই কি ! আমি যার সেবা করবো সে আমার পানে মুখ তুলে তাকাবে না ? দুটো হেসে কথা বলবে না ? পুরুষের কোলে ভাত দেওয়া দেবতার কাছে নৈবেদ্য দেওয়ার মত সব চেয়ে বড় সেবা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুক্তি তার মুখের পানে তাকাল।

রমা বললে, না খেয়ে খেয়ে আর মন গুমরে থেকে এই কদিনে কি দশা [illegible]য়েছে দেখেছো ? ও অসুখে পড়বে।

রমার গলার স্বরে কেমন নিরাশার অতল সুর। শুক্তির মনে করুণার আমেজ জাগে।

আড়াল থেকে লক্ষ্য করে দেখে শুক্তির মনে হলো রমা যা বলেছে সত্য। মাস্টার কাহিল আর রোগা হয়ে গেছে। মুখখানা বিবর্ণ। চোখের কোলে কালি পড়েছে। উদাস চোখে উর্ধ্বমুখে একা শুয়ে শুয়ে কী যে ছাইভস্ম ভাবে সেই জানে। মুখ দেখলে মনে হবে যেন তার বুকের তলায় ব্যথার অতল সমুদ্র লুকিয়ে আছে। খাওয়ার রুচি নেই। তাকে দেখে শুক্তির সমরের কথা মনে পড়ে। তার বুকের ভিতর তুরতুর করে।

একদিন ঘরের দোর থেকে শুক্তি দেখলে মাস্টার বুকে হাঁটু দিয়ে শীতে জড়সর হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে একখানা খদ্দরের চাদর।

শুক্তি ঘরে এসে নিমুকে একখানা গরম আলোয়ান দিয়ে বললে, তোমার মাস্টাব মশায়কে এখানা গায়ে দিতে বলো। বোলো আমি দিয়েছি।

মায়ের নাম শুনে মৃদু হেসে কল্যাণ আলোয়ান খানা নিমুর হাত থেকে নিয়ে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললে, মাকে বলগে আমার শীত কবেনা।

শুক্তি সোজা ঘরে ঢুকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তার চোখে চোখ রেখে আদেশের ভঙ্গিতে বললে, গায়ে দেবেন এখানা। রেখে দিন।

আলোয়ান খানা তার গায়ের উপর ফেলে দিয়ে শুক্তি মুখ ঘুরিয়ে বললে, আমি ছেলের হাতে পাঠিয়ে দিলুম আর আপনি অপমান করে ফিবিয়ে দিলেন।

—ভুল বুঝবেন না। অপমান করবার বাসনা আমার মোটেই ছিল না।

ভগ্নভঙ্গিতে কল্যাণ মুখ নিচু করল।

শুক্তি দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তার মুখের উপর চোখ তুলে শুক্তি ঝলসে উঠল, আপনার হয়েছে কি বলতে পারেন? রমা বলে আপনি খান না। সদাই বিমর্ষ আর মনমরা। মন ভাল নয় বলেই শরীর ভাল থাকচে না। দিন দিন আমাদের চোখের

সামনে শুকিয়ে যাচ্ছেন। কেন? এখানে আপনার ভাল না লাগে বললেই পারেন। আপনাকে তো কেউ জোর করে ধরে রাখেনি। এখানে আমার বাড়িতে বসে অনশন করার কোন মানে হয় না। গেরস্তর অকল্যাণ হয়।

শুক্তি 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কল্যাণ মুহূর্ত চোখ তুলে তার পেছনে তাকাল। একটা বিদ্যুৎ শিখা যেন ঘরখানাকে চকিত করে তুলে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত সে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে তার হঠাৎ মনে হলো কে যেন তাকে এই ঘরের মাঝে বন্দী করে রেখে গেছে। সামনে পেছনে কোনদিকে বেরুবার পথ রাখেনি।

কল্যাণ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিল। একটা আরাম তাকে আঁকড়ে ধরল। দিনটাকে কেমন তার নতুন নতুন ঠেকল। সে একটা লাল পেন্সিল দিয়ে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের তারিখটিতে একটা ঢেঁড়া মার্কা কাটল।

বিকেলে চা দিতে এসে রমা তাব বিছানার পাশে একটা টুলের উপর একপ্লেট খাবার আর চা রেখে বললে, খেয়ে নেন। তারপর লিখবেন। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রমার বলার ভঙ্গিটা আজ নির্ভয়। নিঃশঙ্ক। অনেকটা দাবির মত।

কল্যাণ বিছানার উপব উপুব হয়ে শুয়ে কি লিখছিল। সে মুখ তুলে রমার পানে তাকাল।

চোখে বিদ্যুৎ হেনে সহাস্যে বমা বললে, আজ আর 'না' বলবার জো-টি নেই। আজ বউদি নিজে দাঁড়িয়ে খাবার সাজাতে বলেছে। যা যা বলেছে আমি তাই নিয়ে এসেছি। সব খেয়ে নাও। আমাকে গিয়ে খবর দিতে হবে—জানাতে হবে সব খেলে কিনা।

—ওঃ! তাই নাকি! তাহলে তো সব খেতে হয়। তোমার বউদি তো খুব জবরদস্ত?

রমা আঁট হয়ে একখানা চেয়ারের উপর বসল। আঁচলটা উদ্ধত বুকের উপর টেনে দিতে দিতে চোখে ঝিলিক দিয়ে বললে, দেখতে ছোট্টটি হলে কি হবে। ভারি কড়া মেজাজ। আর রাশভারি।

একখানা টোস্টে কামড় দিতে দিতে মুখ না তুলেই কল্যাণ জিজ্ঞেস করলে, তুমি খুব ভয় করো বুঝি বউদিকে?

—শুধু আমি? বাড়ির সরকার গোমস্তা সবাই ওকে সম্মান করে, ভক্তি করে। অমন মনিব পাওয়া ভাগ্যের কথা।

কল্যাণ নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে থাকে। সে অনর্গল বকে যায়। সব কথা কল্যাণের কানে যায় না। না যাক। রমা বলতে পেরেই খুশি। একসঙ্গে এতো কথা বলবার তার সুযোগ সুবিধা বা সাহস হয়নি কোনদিন।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে কল্যাণ বললে, তা আমার সঙ্গে তোমার এমন কি শত্রুতা যে তুমি ওঁর কাছে আমার বিরুদ্ধে যা তা বলেছো।

তার কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

ম্লান চোখে, শুকনো মুখে রমা বললে, যা-তা আবার কি বললুম? না খেয়ে খেয়ে রোগা ডিগডিগে হয়ে যাচ্ছো তাই। এখানে একটা ভারি অসুখে পড়লে তোমায় দেখবে কে বাপু?

কৌতুক করে কল্যাণ বললে, কেন, তুমি দেখবে না? আমার শরীরের ওপর তোমার এত দরদ!

রমা চঞ্চল হয়ে উঠল। আরক্ত মুখে সে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, আমার দরদের উপর কি তোমার কোন ভরসা আছে?

—না। তা নেই।

প্রসঙ্গটায় ছেদ টানবার জন্যই যেন মুখ ঘুরিয়ে সহসা সে খাতাখানা কোলে তুলে নিল।

রমা তবু নড়ে না।

সে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। তার চোখের

ভাল লাগাকে যেন সে শেষ করতে চায় না। সুন্দর তার মুখের গড়ন। মেয়েলি ছাঁদের মোলায়েম মুখ। চাঁচা-ছোলা টিকোলো নাক। বড় বড় টানা কালো চোখে তীক্ষ্ণবুদ্ধির স্বচ্ছ আলো জ্বল জ্বল করছে। তুলিতে আঁকা সরু ভুরু। শুধু মাথা তুলে তাকাবার সহজ ও সতেজ ভঙ্গিমায় তার কঠিন পৌরুষ। তার পৌরুষকে সমীহ করতে হয়।

মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে কল্যাণ বললে, না আমার ভাবনার বোঝা চাপিয়ে তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইনা। আমাদের জন্যে সরকারী হাসপাতাল আছে।

রমাকে সেদিনের মত নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হলো। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছিল তার ভিতরের খবর। জীবনের ছোটখাটো কাহিনী! কিছুই জানা হলো না।

না হোক। তবু সে খানিক পথ এগোতে পেরেছে ভেবে আশ্বস্ত হলো।

কতদিন আর সাড়া না দিয়ে চুপ করে থাকবে। ডাকের মত ডাকতে পারলে ভগবান সাড়া দেন। মানুষ তো ছাড়।

ধারার কোন খবর নেই। কোথায় সে, কলকাতায় ফিরেছে কিনা তাও জানা নেই। একখানা চিঠি পর্যন্ত দেয়নি। অথচ তিনমাসের জায়গায় পাঁচ মাস কেটে গেল।

শুক্তির মনে খটকা লাগে। কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না তো? কে জানে? তার কলকাতার ঠিকানাও জানা নেই যে সে তার খবর নেবে।

মন তার অপেক্ষা করে থাকে। বেঁচে থাকলে সে আসবেই। নিমুকে ভুলে যাবে না।

নিমু কিন্তু তাকে ভুলে যাচ্ছে। তার নামও করে না। তার দোষ কি? তার শিশুমনে সে অস্পষ্ট ও ধূসর হয়ে আসছে। তার

সঙ্গে কতটুকু বা পরিচয়। তাকে মনে করে রাখবার মত নিবিড় কোন স্নেহ সম্পর্ক তো নেই।

একদিক বিয়ে শুক্তির নিজেকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন মনে হয়। গভীর অন্তরে সে একটা স্বস্তি পায়। নিমু তার জীবনের একটী মাত্র গোপনতা। সংসারের চোখে ধুলো দিয়ে সে তাকে সমরের ও তার সন্তান সাজিয়ে লালন করছে। পরের সন্তানকে ছদ্মবেশ পরিয়ে এই বৃহৎ বংশের পারিবারিক মর্যাদা দিয়েছে। নিজের মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটাবার জন্য তাকে এই কপটতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। মাঝে মাঝে তার গভীর অন্তরে এমনি একটা চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকে। তার সংস্কারে কাঁটা বিঁধতে থাকে। মনে হয় স্বামীর বংশগরিমাকে সে ক্ষুণ্ণ করতে বসেছে।

শুক্তির মনের কাঠামো সেকালের। একান্ত স্পর্শভীরু, আচারনিষ্ঠ ও দেবদ্বিজে ভক্তিমতী। আকস্মিক সম্পদের ভিড়ে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। শ্বশুরকুলের ঐতিহ্য ও বংশমর্যাদা সম্বন্ধে সে বিশেষভাবে সজাগ ও সচেতন।

নির্মাল্যের প্রকৃত বংশপরিচয় আজো তার অজ্ঞাত। ধারার মুখেই শুনেছে তারা জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং নির্মাল্য তার বিবাহিত স্বামীর সন্তান। ধারা স্বামী পরিত্যক্তা নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল। তারই কথায় বিশ্বাস করে শুক্তির শোকাকুল ক্ষুধিত মাতৃত্ব নিমুকে আঁকড়ে ধরেছিল।

ধারা সহসা অন্তর্হিত হওয়ায় একটা কালো সংশয় তার মনকে থেকে থেকে উতল করে তোলে। একটা ভয়ও হয়। কে জানে এই নিমুকে নিয়ে ভবিষ্যতে তাকে কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে কিনা। তা ছাড়া নিমুকে সকলে তার গর্ভের সন্তান, সমরের সন্তান বলেই জানে। নিমু জানে শুক্তিই তার মা। স্বর্গত সমর মুখুজ্জে তার পিতা। আজকাল সে পিতৃপরিচয় দিতে শিখেছে। পিতা সম্বন্ধে মার কাছে প্রশ্ন করতে শিখেছে। তাই তার বুকের নিচেটা মুচড়ে ওঠে।

রাত্রে ঘুমন্ত ছেলের পানে চেয়ে সে ছটফট করতে থাকে। তাকে এই মিথ্যার মুখোশ পরিয়েই আজীবন রেখে দেবে? কর্ণের মত রাধাপুত্র সেজেই থাকবে সে? কিন্তু ওর সত্য পরিচয় গোপন করে কেমন করে সে তার পুণ্য শ্বশুর কুলে ওকে প্রতিষ্ঠা করে যাবে! বংশের ধারা বদলে দেবে সে কেমন করে? নিজে বাঁচবার শখ মেটাবার জন্য সে একটা বংশধারাকে কলঙ্কিত করতে পারবে না। নির্মাল্যের সত্য পরিচয় জানবার জন্য সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। অথচ পথ খুঁজে পায় না। লোকলজ্জায় কারুর কাছে সত্য প্রকাশ করতে পারে না।

নিমু এসে বলে, মাস্টার মশায়ের গা গরম হয়েছে। দেখবে এসো না মা। খুব গবম।

—সত্যি? আচ্ছা ডাক্তারকে খবর দিতে বলছি। ওযুধ খেলেই ভাল হয়ে যাবে।

নিমু বলে, তুমি দেখবে এসো না মা।

সে একরকম টানতে টানতেই মাকে নিয়ে গেল মাস্টারের ঘবে।

মাস্টাব সেই আলোয়ানখানা আপাদমস্তক চাপা দিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

নিমু বললে, মা এসেছে মাস্টাব মশায়।

—কেন, মাকে ডাকলে কেন?

কল্যাণ কনুইয়ে ভব দিয়ে ওঠবাব চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না। একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ করে সে লুটিয়ে পড়ল।

তার মুখেব পানে চেয়ে শুক্তি শিউরে উঠল। আরক্ত মুখ। চোখদুটো কুঁচের মত টকটকে লাল।

শুক্তি ডাকল, মাষ্টার! মাষ্টার!

মুহূর্ত চোখমেলে তারপানে তাকাল মনে হলো। তারপর চোখ-দুটি বুঁজে গেল। সাড়াশব্দ দিল না।

কল্যাণ জরেব ঘোরে অচৈতন্য হয়ে গেছে। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে শুক্তি টেম্পেবেচার নিয়ে দেখল, একশো পাঁচ ডিগ্রি।

বাড়ির সব ভিড় করে ঘরে ঢুকল।

রমা বললে, আমি জানতুম। ওর এইখানেই মাটি কেনা।

শুক্তি তাকে ধমক দিল।

নিমু মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, মাস্টার মাশায়কে ভাল করে দাও মা।

ডাক্তার বললে, জ্বরটা বাঁকা। ম্যালিগন্যান্ট টাইপের। তবে এখুনি ভয়ের কোন কারণ নেই। মাথায় বরফ চলুক। ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যে বিনিদ্র রাত পোহাল। কিন্তু তার জ্ঞান ফিরল না। সারারাত সে কি ছটফটানি। রুগীকে বিছানায় ধরে রাখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম প্রলাপ। রমা স্বেচ্ছায় তার শুশ্রূষার ভার নিল। সারারাত আইস্ ব্যাগ ধরে তার শিয়রে বসে রইল। শুক্তিও ঘর থেকে গেল না।

শুক্তি স্তম্ভিত হয়ে গেছে কল্যাণের মুখে ধারার নাম শুনে। প্রলাপের মাঝে সে অনবরত মা আর ধারাকে ডেকেছে। তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। মাঝে মাঝে নিমুরও নাম করেছে। কী যে বলেছে বুঝতে পারেনি শুক্তি। তবে ধারার নাম সে স্পষ্ট শুনেছে।

এ কোন্ ধারা? ধারা নামে কেউ ওর অন্তরঙ্গ আত্মীয় আছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে কোন ধারা? তার পরিচিত ধারা নাকি? সংশয় বিচলিত মন তার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।… নিমুর কথা কি ও জানে নাকি!

তিনদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে আবার সে জীবনের অঙ্গনে এসে দাঁড়াল! ভোরের দিকে তার চেতনা ফিরে আসতেই সে রমার কোলের উপর একখানি হাত রেখে ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করল, তুমি ধারা?

রমা নিঃশব্দে তার হাতখানি সস্নেহে চেপে ধরে বললে, কি বলছো? জল খাবে?

স্তিমিত আলোয় সে একবার চোখ তুলে রমার মুখপানে তাকাল। বোধ হয় তাকে চিনলো। একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, না! অবসন্নের মত সে চোখ বুঁজল।

ভোরের দিকে শুক্তি নিমুর কাছে গিয়ে শুয়েছিল। খবর পেয়ে সে ধীর পায়ে ঘরের মেঝেয় এসে দাঁড়াল।

রমা প্রসন্নচোখে তারপানে চেয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিল ঘুমিয়েছে।

শুক্তি মৃহুকণ্ঠে বললে, বেশী কথা বলতে দিসনা। ঘুমুক।

শুক্তির গলার স্বর শুনতে পেয়ে কল্যাণ একবার চোখ মেলে তাকাল। তন্দ্রার আবেশে জড়িত স্বরে প্রশ্ন করল, কে ?

কেউ কোন কথা বলল না।

শুক্তি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শুক্তি আর আসে না। কেন আসে না সেই জানে। বাইরে থেকেই সব খবর রাখে।

ডাক্তার বলেছে, বিপদ কেটে গেছে। শুক্তির মনের আকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। রমার মুখে হাসি ফুটেছে। সেবার জোরে সে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। গৌরব করতে পারে বই কি !

মাস দুই কেটে গেছে।

কল্যাণ অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। রমার সেবায় আর বসন্তের নতুন হাওয়ায় পাতা-ঝরা পল্লব ফুঁড়ে আবার চিকন পাতা গজাচ্ছে। চোয়ালের উঁচু হাড় দুটো অনেকটা ঢাকা পড়েছে। গালে, কপালে রক্তের আভা ফুটেছে। সে যেন আরো দীর্ঘ আরো শ্রীমান হয়েছে। তার সুশ্রী মুখের সৌকুমার্য বেড়েছে।

শুক্তি তার সামনে যায়না। আড়াল থেকে, দূর থেকে দেখে। অনাত্মীয় আতুরকে যে সে সঙ্কটাপন্ন রোগ থেকে নিরাময় করে তুলতে পেরেছে, তাতেই তার তৃপ্তি। ছেলের মুখে হাসি ফুটেছে। ছেলের মুখের হাসি কিন্তু মাকে মাঝে মাঝে বিপন্ন করে তোলে। ছেলে যেন তার একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে উঠছে। এর পর ওদের দুজনকে পৃথক করা দায় হয়ে উঠবে।

আর দায় হবে রমাকে সামলানো। মাষ্টার সেরে উঠেছে কিন্তু রমার এখনো কাজ ফুরোয়নি। ঘড়ির কাঁটা ধরে তাকে খেতে দেওয়া,

তার ঘরের জিনিষপত্তর গুছিয়ে রাখা, তার তদ্বির করা যেন রীতিমত দাবির চেহারা নিয়েছে। আগেকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। রীতিমত দুঃসাহসিক হয়ে উঠেছে সে। যা কিছু সমীহ শুক্তিকে।

কল্যাণ মনে মনে হাসে। মুখে কিছু বলেনা। বলবে কেমন করে? যে এত করল, কিছুটা কৃতজ্ঞতা, কিছুটা প্রতিদান তার প্রাপ্য বই কি। মুখের একটু হাসি কিংবা দুটো মিষ্টি কথায় যদি সে খুশি হয়। হোকনা।

শুক্তি একদিন বেশ গম্ভীর হয়েই রমাকে বললে, একটু মজা করতে চাস কর রমা, কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে আঙুল পোড়াস নি।

রমার চোখ ভরে জল এলো। সে দুহাতে মুখ ঢেকে বলে উঠলো, আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি বউদি। পুড়ে ছাই হওয়া ছাড়া গতি নেই।

শুক্তি বিস্মিত আতঙ্কে তার মুখপানে চেয়ে বললে, তার জীবন নিজের কিনা না জেনেই তুই এ কাজ কেন করলি? এখনো সময় আছে। নিজেকে সরিয়ে নে।

-- প্রাণ থাকতে আমি তা পারবো না বউদি। ও আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারে, আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে নিতে বলবে কেমন করে?

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে শুক্তি নিজের মনে বললে, এই একটি মাত্র জিনিষ ছাড়া পৃথিবী অচল। মেয়ে জীবন অর্থহীন।

নিমু ঘরে এসে শুক্তিকে বললে, আজ খুব মজা হয়েছে জানো মা?

—কি মজা গো?

—মাসি-মা আসছিল আমাদের বাড়ি। মাষ্টার মশায়কে দেখেই ভয়ে জুজু। মাষ্টারমশায় খুব বকুনি দিয়েছে। এখানে আসতে তাকে মানা করে দিয়েছে।

—সে কি রে? তুই কিছু বললি না?

—ওরে বাবা! মাষ্টারমশায়ের রাগ তো তুমি দেখনি।

মাসিমা গেল কোথা?

—চলে গেল।

শুক্তি একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে, কোন মাসি-মা? ধারা মাসিমা?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি যেন মাসিমাকে চিনিনা?

নিমু ঘুমোলে শুক্তি কল্যাণকে ডেকে পাঠাল। কল্যাণ এসে ঘবে ঢুকতেই, শুক্তি প্রশ্ন কবল, মাষ্টার মশায় আপনি ধারাকে চেনেন?

কল্যাণ প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। সে সবিস্ময়ে শুক্তির পানে চেয়ে রইল। তারপব ঢোক গিলে প্রশ্ন করল, কোন ধারার কথা বলছেন? যে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? আপনাকে কে বললে? নিমু বুঝি?

—হাঁ।

—আপনারা তাকে চিনলেন কেমন করে?

শুক্তি শুষ্কস্বরে পালটা প্রশ্ন করল, আপনি তাকে চিনলেন কেমন করে?

কল্যাণ মুখ না তুলেই উত্তব দিল, সে আমাব আত্মীয়।

কথাটা শুধবে নিয়ে বললে, আমাব সঙ্গে জানা চেনা ছিল।

তার মুখেব ভঙ্গি দেখে শুক্তির হাসি পেল। কিন্তু সে নিজের গাম্ভীর্য অটুট রেখেই বললে, মাপ করবেন আপনাকে বসতে বলতে ভুলে গেছি। বসুন।

সামনে বসলো কল্যাণ।

শুক্তি বললে, ধারা আমাদেব পবিচিত। আমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল। আপনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন?

অপবাধীব ভঙ্গিতে সে বললে, আমি তো তা জানতুম না। সেও তো কিছু বললে না। নিমু তাকে চেনে?

—নিমু তাকে মাসিমা বলে।

—কিন্তু সেও তো কিছু বললে না?

হাসল শুক্তি মৃদুরেখায়। বললে, সে আপনার রুদ্র মূর্তি দেখে ভয়ে কিছু বলতে পারেনি।

—সম্ভব। কিন্তু তাহলে তো আমি ভুল করেছি। খুব অন্যায় করেছি। আমি ভেবেছিলুম আমি এখানে আছি জানতে পেরে সে আমার পেছনে ধাওয়া করেছে। তাই—

শুক্তি বললে, আপনার সঙ্গে তাহলে ওর সম্বন্ধটা প্রীতির নয়?

—না।

সংক্ষেপে উত্তর দিল কল্যাণ।

—বলবেন কি, অবিশ্যি যদি কোন আপত্তি না থাকে, ওর সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

কল্যাণ মাথা নিচু করে কি ভাবল। জবাব দিতে পারল না। তাকে যেন বড় শূন্য দেখাল। কেমন যেন অবসন্ন ও অপচিত।

শুক্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, মনে যদি ব্যথা লাগে বলতে হবে না। রোগা শরীরে কোন উত্তেজনা ভালো নয়।

শুক্তির গলায় একটি কোমল টান। চোখ তুলে তাকাল কল্যাণ। দৃষ্টির সজ্ঘর্ষ হলো দুজনে।

কল্যাণ নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে বললে, না। ও সব বালাই আমার নেই। ব্যথা-বেদনার অনুভূতিগুলো পাথর হয়ে গেছে। তবে আপনার মনে ব্যথা লাগতে পারে। নাই শুনলেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুক্তি জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু ওকে তাড়িয়ে দিলেন কেন?

—ভেবেছিলুম আমার এখানকার বাসা ভাঙতে এসেছে। আমাকে এখান থেকে নির্বাসিত করতে এসেছে।

—কিসের আক্রোশ?

—সে এক হাস্যকর প্রহসন। আরেকদিন শোনাবো এখন। আমার ভারি ঘুম এসেছে।

হঠাৎ যুক্ত হাতদুটি কপালে ঠেকিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

উদভ্রান্তের মত সারা দুপুর শহরে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ধারা স্টেশনে এসে বসল। বসলো ওয়েটিং রুমের ভিতরে নয়। বাইরের বেঞ্চে। ভিতরে একদল মেয়ে হাসির হিল্লোল তুলে জটলা করছে। স্কুল কলেজের আইবুড়ো মেয়ের দল। বোধ হয় কলকাতা থেকে পিকনিক করতে এসেছিল চন্দননগরে। কলেজেব কমনরুমের মত হাসিব ঢেউ উঠছে। অনর্গল হাসি। হাসি, শুধু কি মুখই হাসছে ওদের? ওদের দেহের স্তবকে স্তবকে হাসি। শাড়িব ভাঁজে ভাঁজে হাসি। হাসি ছাড়া মুখের আব কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কাজ কি ওদের নির্ঝরিত হাসির মুখে পাথব চাপা দিয়ে! তা ছাড়া ওদেব মাঝে নিজেকে অত্যন্ত বেমানান ও বেখাপ্পা দেখাবে। আব কিছুতে না হোক অন্তত বয়সে আব পোষাকেব ঝলকানিতে। তাই ধাবা ভিতবে না গিয়ে বাইরে বসল।

অবসান বেলা। আকাশে লাল আলোর বন্যা। স্টেশনের ও-পারের ঝাউ আর দেবদারু গাছের মাথাগুলো সেই আলোর আভায় সমুজ্জ্বল। উদাসীন দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে সে স্থির হয়ে বসে বইল। অবসান বেলার মতই নিজেকে অত্যন্ত অবসন্ন মনে হলো। ভীষণ হৃতবল মনে হল। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা দারুণ অবসাদ যেন তাকে গ্রাস করে ফেলছে। সারাদিন সে অভুক্ত।

ওর সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ও ফুরিয়ে গেছে। অভিমানে, অপমানে আর প্রত্যাখ্যানে ও বিমূঢ় ও হতচেতন। থেকে থেকে তার সমস্ত শরীর হিমশীতল হয়ে আসে। কাঁপুনি ধরে। মনে হয় এখুনি সে পড়ে যাবে।

সামনে দিয়ে চা-ওলা যাচ্ছিল। এক পেয়ালা গরম চা খেল।

একখানা পশ্চিমের গাড়ি এলো আপ প্লাটফরমে। ভিড় করে লটবহর নিয়ে যাত্রি নামলো। ওভারব্রিজ পার হয়ে যাত্রিরা বাইরে গেল তার সামনে দিয়ে। ধারা চেয়ে চেয়ে দেখল। কারুর মুখে মিলনের প্রত্যাশা। কারুব মুখে বিচ্ছেদ বেদনা।

ঢেউ কেটে গেলে ধারা আবার নিঝুম হয়ে গেল। সকালের অপমানেব চেহারাটা কল্পনা কবে আবার তাব সর্বাঙ্গ অবশ ও হিম হয়ে এলো।

আঘাতটা এমনি অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত যে তাব মনে হলো তার মাথায় একখানা প্রকাণ্ড পাথর ধ্বসে পড়ে তাকে চুরমার কবে দিল। আকস্মিকের সে প্রচণ্ড বেগ ও গতি সামলানো তাব পক্ষে দায় হয়ে উঠলো। সে না পাবলে চোখ তুলে কল্যাণেব মুখের পানে তাকাতে না পারল তাব কথাব কোন জবাব দিতে। দীর্ঘদিন পবে নিরুদ্দিষ্ট কল্যাণেব সঙ্গে যে এখানে এমনভাবে দেখা হবে সে কল্পনা করবে কেমন কবে? সে যেন চাবুক হাতে নিয়ে তাব প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখেই কল্যাণের কালো চোখে এমনি হিংস্র অমানুষিক দৃষ্টি ফুটে উঠল যে সেই দৃষ্টির আঘাতেই ওব শরীর অবশ হয়ে গেল। তার চেতনা লোপ পেল। ধারাব মনে হলো কল্যাণ যেন প্রেতলোক হতে সদ্য উঠে এলো তাব উপব প্রতিশোধ নিতে। কোন ভূমিকা না করেই সে যেন তার পিঠেব উপর সপাসপ চাবুক কষে দিল। কী যে বলল কিছুই তার কানে গেল না। কিছুই তাব মনে পড়ে না। নিমুব সামনে তাকে বাড়িব দরজা থেকে দূব কবে দিল। হ্যাঁ। নিমু বেচাবা হতচকিতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। কোন কথা বলতে পারলে না।

ধাবাব জীবনের সব চেয়ে বড়ো বিস্ময় কল্যাণ ওখানে এলো কেমন করে। নিমুকেই বা চিনল কেমন করে? কোন কিছুই তাব জানা হলো না। দাঁড়িয়ে মার খেয়ে নিঃশব্দে ফিবে আসতে হলো। শুক্তি হয়তো জানতেও পারবে না।

কিন্তু সে নিজেই বা প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কেন? বাধা দিল না কেন, শুক্তিকে জানাবার চেষ্টা করল না কেন? নিমুকে ডাকলো না কেন!

কী যে তার হলো। কল্যাণকে আচমকা দেখেই সে যেন মুর্চ্ছা গেল। হারিয়ে ফেলল বিচারবোধের শক্তি।

হারাবারই তো কথা। দুজনের মাঝে যে প্রেতলোকের দূরত্ব। সেই দূরত্ব পেরিয়ে যে এমনভাবে সে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠবে, সে ভাববে কেমন করে? ভেবে বিশ্বাস করতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই যে সব কিছু ঘটে গেল।

আশ্চর্য! যে বাহু দিয়ে রাতের পর রাত তার কণ্ঠমালা রচনা করেছে, সেই বাহু গেল পঙ্গু হয়ে। যে দুর্বার শক্তি দিয়ে তার চারি পাশে মায়া বচনা করে তাকে জয় কবেছিল সে শক্তি গেল লুপ্ত হয়ে। যে বাঙ্ময় ওষ্ঠ চুম্বনমুখর হয়ে উঠতো সেই ওষ্ঠ গেল নিস্পন্দ নিথর হয়ে।

একদা এই কল্যাণ ধারাকে মুগ্ধ করেছে। বিস্মিত করেছে। অন্ধ করেছে। পাগলের মত তাকে পাবার জন্য ধারা আকাশ পাতাল করেছে।

ক'দিনেরই বা কথা যে এরই মধ্যে সে বিস্মৃত হবে।

না। না। ভোলেনি ধারা। কিছুই ভোলেনি। পেছন ফিরে তাকালেই তার চোখে পড়ে। বাঁকা ছুরির ফলার মত বিঁধে আছে তার বুকের তলায়।

কল্যাণ আজ তার ঘাড় ধরে পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে। তার চোখে আঙুলের খোঁচা দিয়ে চোখ খুলে দিয়েছে। যা ধূসর হয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তার চোখের সামনে:

মেদিনীপুরের একটা আধা-শহর। ধারার দাদার ছিল একটা ভাতের হোটেল। বাজারের কাছে। তাদের বাড়ি ছিল শহরের উপকণ্ঠে।

ধারার দাদা শিবু গাঙ্গুলী ছেলেবেলা থেকে স্বদেশী করে যৌবনে একটা রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা হয়ে ওঠে। শহরে তার খুব নামডাক। তরুণদের চোখে সে স্বয়ম্ভু। সে সব্যসাচী।

স্টেশনের মুটে মজুর রিক্সাওয়ালা সবাই চেনে শিবু ঠাকুরকে। সবাই তাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে।

দেশ জুড়ে আগষ্ট বিপ্লবের প্রস্তুতি চলেছে। গুপ্ত বৈঠক বসে শিবু ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে। সংগ্রামের সেনা সংগ্রহ চলে। মুক্তিকামী বিক্ষুব্ধ তরুণদল গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে দলে দলে ভিড় জমায়।

শিবুর লেফটেন্যান্ট হিসাবে কল্যাণ একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে সেই সংগ্রামে। সে তখন সবে বি, এ পাশ করেছে। বাল্যকাল থেকেই কল্যাণ উদ্দাম। দুঃসাহসী। যৌবনে সে অসহিষ্ণু ও উদ্ধত হয়ে ওঠে। একমাত্র সন্তানের চিন্তায় তাব বিধবা মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। শ্রাবনের দুর্যোগময়ী রাত্রি। বিদ্যুৎ বিদারিত। কৃষ্ণীভূত আকাশ। ধারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

শেষ রাত্রে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। জানলা বন্ধ করতে উঠতেই তাব মুখে চোখে টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ে। দাদা ফিরেছে। ভিজতে ভিজতে উঠোন পাব হয়ে সে দরজা খুলে দিল। সে অবাক হয়ে গেল দাদার কাঁধে এক আহত তরুণকে দেখে।

তার পূর্বে তো সে কল্যাণকে চিনতো না। যুদ্ধের আহত সৈনিক।

দুজনে ধরাধরি করে কল্যাণকে তুলে দিল ঘবের মাচানের উপর।

কল্যাণেব মাথায় ব্যাণ্ডেজ। লাঠির আঘাতের জখম।

শিবু বললে, ঐখানে ও থাক। তুই ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন ওর অস্তিত্ব টের না পায়। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। এই ওষুধ

রইলো। চার ঘণ্টা অন্তর এই ট্যাবলেটটা খাইয়ে দিস। গরম দুধ আর চা খেতে দিবি। যদি ধরা না পড়ি কাল একসময় এসে দেখে যাবো।

ধারার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে শূন্যদৃষ্টিতে দাদার মুখপানে চেয়ে রইলো। শিবু তার চিবুক ধরে আদর করে বললে, ভয় কি রে? এই শুকনো মুখ আর চোখের জলই কি হবে আমার বোনের পরিচয় নাকি?

ধারা আঁচলে চোখ মোছে।

শিবু বললে, আমি ধরা পড়লে কি তুই বুক চাপড়ে কেঁদে বেড়াবি নাকি? পারবি না পুলিশের গুলির মুখে বুক পেতে দিতে? যাকগে আর আমার সময় নেই। আবার দেখা হবে।

তার গালে হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু হেসে বললে, ভয় নেই. এখন আমি ধরা পড়বো না। এখুনি ধরা পড়লে চলবে না।

উপরের মাচার পানে চেয়ে শিবু বললে, ওকে দেখিস। তোর জিম্মায় রেখে গেলুম। ও আমার ডান হাত।

ধারা আহত কল্যাণের সেবার ভার নিয়ে মাচার উপর তার শিয়রে গিয়ে বসল। পুলিশের লাঠির ঘায়ে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। মাথায় প্রচণ্ড ক্ষত।

গভীর রাত্রে বিপ্লবীরা শহরের ডাকঘর লুট করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র পুলিশ আর মিলিটারী এসে শহর ঘিরে ফেলেছে।

বাড়িতে পুলিশ এসে শিবুর খোঁজ করে গেল। ধারাকে প্রশ্নের তীর মেরে মেরে জর্জরিত করে তুলল। ধারা জবাব দিল, সে বাড়িতে আসে না। হোটেলেই থাকে। হোটেল ওলোট পালোট করে তল্লাসী করেছে। শিবুর খোঁজ পায়নি।

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শিবু প্রত্যহ বাড়িতে এসে ধারার ও কল্যাণের সংবাদ নিয়ে যায়। কল্যাণের জন্য ঔষধ পথ্য দিয়ে যায়।

ধারা নির্বাক বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে দেখে। সে একদিন

কল্যাণকে ঝকঝকে একটা রিভলভার দিয়ে গেল। কল্যাণ নিঃশব্দে মৃদু হাসল।

শিবু ধারাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধারা মাচায় উঠে দেখে কল্যাণ সোজা হয়ে বসে লুব্ধ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে রিভলভারটা নেড়ে চেড়ে দেখছে। তার চোখে মুখে একটা গোলাপী হিংস্রতা। সঙ্গে সঙ্গে একটা উল্লাস ফেটে পড়ছে।

ধারা তাকে নতুন চোখে দেখল। কল্যাণকে তার নতুন নতুন ঠেকল। তার দেহের সৌকুমার্য তাকে মুগ্ধ করল। সে প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে রইল। কল্যাণ চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে একটা অপরূপ দীপ্তি। কঠিন পৌরুষভরা দুঃসাহসের ইঙ্গিত। তার মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস।

হাসিভরা মুখে কল্যাণ বিভলভারটা তাব দিকে উচিয়ে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলে, এটা কি জানো?

ধারার বুকের নিচে একটা আগুনের শিখা খেলে গেল। সে আরক্ত মুখে চোখে ঝিলিক দিয়ে বললে, আমাব ওপর দিয়েই পরীক্ষা করবে নাকি ওটা ঠিক আছে কিনা।

অন্যমনস্ক গাম্ভীর্যে কল্যাণ বললে, ঠিক আছে। ঠিক জায়গাতে হাত দিয়ে টেপো। এখুনি কথা বলবে।

—রক্ষে কবো। আর কথা বলিয়ে কাজ নেই।

হাসতে হাসতে ধারা তাব কাছে গিয়ে বসল। কল্যাণ তার হাতে ঝকঝকে বন্দুকটা দিয়ে বললে, দেখো। ভেতরে যার আগুন তার গা-টা কী ঠাণ্ডা!

ধারা তির্যক ভঙ্গিতে কটাক্ষ হেনে বললে, তোমার মতো।

--আমাব মতো?

মধুর ভঙ্গিতে ধারা মাথা নেড়ে বললে, হাঁ, ঠিক তোমাবি মত।

দুজনের নিঃশব্দ দৃষ্টির সঙ্ঘর্ষ হলো।

নিত্য নতুন খবর দিয়ে যায় শিবু। সবরেজেষ্ট্রি আপিস আক্রমণ। রেল স্টেশনে অগ্নিসংযোগ। পথঘাটের অচল অবস্থা। টেলিগ্রাফের তার ও পোষ্ট নষ্ট। তা ছাড়া আহত, নিহত ও গ্রেপ্তারের সংবাদ। কল্যাণ উত্তেজনায় অধৈর্য হয়ে ওঠে।

ধারা হাসে। বলে, ঠ্যাং যদি দেহের ভার সইতে পারতো, না জানি কি করতে। লক্ষ্মী ছেলের মত আরো কিছুদিন পা-টাকে আমায় মালিস করতে দাও। তারপর—

নিজের অসহায়তায় লজ্জিত হয় কল্যাণ।

ধারা কিন্তু ফাঁদে পা দিয়েছে।

'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কোথায় কে পা দেয় কে জানে।'

ধারাও জানতে পারল না। অলক্ষ্যে, নিজের অগোচরে, কখন, কেমন করে সে ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল। শুধু বুঝতে পাবল আর তার মুক্তির কোন পথ নেই। নিজের সঙ্গে লড়াই করে কোন ফল হবে না।

দেহে তার ভরা-ভবতি যৌবন। এতোদিন কোন উৎক্ষেপ ছিল না। হঠাৎ তরঙ্গ উঠেছে। প্লাবনেব বেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে অথই জলে ভাসতে ভাসতেও কল্যাণের হাত ধবতে পারল না। সাহস হলো না। বিপদের তবঙ্গ কিন্তু তাকে ধাক্কা দিয়ে একদিন চড়ায় তুলে দিল

শিবু ফেরার। ক'দিন আব তার কোন উদ্দেশ নেই।

কল্যাণ অনেকটা সেরে উঠেছে। একা একা মাচা থেকে নেমে বাড়ির ভিতব চলাফেরা করে।

সেদিনও কল্যাণ রাত্রির অন্ধকারে পেছনের উঠোনে ঘুরছিল। ধারা রান্না করছিল। হঠাৎ একঠা টর্চের তীব্র আলোকরশ্মি সদরের বাইরের পথে এবং পথ থেকে উর্ধ্বে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে বাকি রইল না যে পুলিশ বাড়িতে হানা দিতে এসেছে।

কল্যাণ এবং ধারা তৈরি হয়েই ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল

এখান থেকে তাদের শীঘ্র যেতে হবে। ধারার জন্যই কল্যাণ বিব্রত হয়ে উঠেছিল।

ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলিয়ে পুলিশটা ধারার উপর নির্যাতন সুরু করলে। অকথ্য ভাষায় তাকে গালাগাল দিয়ে হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। বললে, ডেপুটি সাহেবের হুকুম। তাকে থানায় যেতে হবে।

অন্ধকার থেকে বন্দুকের আওয়াজ হলো। পুলিশ ধারাকে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

ধারাকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণ রাত্রির অন্ধকারে ডুব দিল।

সুরু হলো তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। পাড়ি দিল অজানা পথে। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, পোড়ো চালাঘরে রাত কাটিয়ে কোনরকমে দুজনে মেদিনীপুরে এসে একখানা ঘর ভাড়া করল।

গেরস্ত বাড়ি। পরিচয় দিল স্বামী-স্ত্রী। ধারা এর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। কল্যাণের অগোচরে শাখা সিঁদুর পরে রীতিমত বউ সাজলো। চমকে গেল কল্যাণ। কিন্তু বলবার কিছু নেই।

ধারা নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে সে কল্যাণের মনের মাটি ভিজিয়ে রেখেছিল। তারপর এই সন্নিকট সান্নিধ্য, সঙ্কীর্ণ ঘরের নিবিড় নির্জন পরিবেশ দুটি তরুণ হৃদয়কে আরো কাছাকাছি এনে দিল।

কল্যাণ অশেষ চেষ্টা করেও নিজেকে বাঁচাতে পারল না। ধারার কামনাময় সঙ্কল্পের কাছে তাকে হার মানতে হলো। ধারার মোহিনী-মায়া তাকে জয় করে নিল। কতকটা করুণাবশেই কল্যাণ ধারার কাছে ধরা দিল।

ধরা সে দিল। কিন্তু এটাকে সত্য বলে সে মেনে নিতে পারল না। মনে হলো এ অন্যায়। এ ব্যাভিচার। এর পেছনে সূক্ষ্ম কোন অনুরাগ নেই। প্রেমের প্রেরণা নেই। নিজেকে কলঙ্কিত মনে হলো। এ তার পদস্খলন। এ তার অধঃপতন। অথচ ধারাকে অত্যন্ত সুখি

মনে হতো। সে যেন দেখতে দেখতে চোখের সামনে নতুন হয়ে উঠল। বন্যার প্লাবনের মত দেহে নামলো রক্তের উচ্ছ্বাস। লাবণ্যের প্লাবন। হাসিতে নতুনতরো গরিমা।

ফেরারীর জীবনে সে এক নতুনতরো আস্বাদ। হাসপাতালের রুগীর চোখে নার্সের ফুলন্ত রূপের মত। চোখকে আরাম দেয়। আবেশের ঘোর লাগে মনে।

পুলিশের গুলিতে শিবু ঠাকুর নিহত হয়েছে। ফলাও করে খবর বেরিয়েছে কাগজে। শহিদ শিবুর ছবি বেবিয়েছে। পুলিশের এক পদস্থ কর্মচারীকে মেরে শিবু নিজের প্রাণ দিয়েছে।

ধারার চোখে যা ভয়াবহ, কল্যাণের কাছে তা গৌরবময়। শিবুর গৌরবময় মৃত্যু তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। নিজের এই নিষ্ক্রিয়তায় নিজের উপর ঘৃণা হয়। সারা দেশের বুকে বিপ্লবের তাণ্ডব চলেছে আর সে মুখ লুকিয়ে এই সৌখিন আলস্যের ক্লেদকুণ্ডে ডুবে আছে একটা মেয়ের মুখ চেয়ে। ধারার প্রতি একটা অপরিসীম বিরাগে তার মনে ভরে গেল। মনে হলো ধারা তার যৌবনের মোহিনী মায়ায় তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাকে অন্ধ করে রেখেছে। নিজের উপর তার ধিক্কার হলো।

এ ঘৃণিত বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সে দৃঢ় সঙ্কল্প করল। ধারার সঙ্গে নিজের এই সম্পর্কটাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ এবং কদর্য মনে হলো।

আর এর জন্য ধারাকেই দায়ি মনে হলো। কি করে যে তার সমস্ত শুভ বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ধারা তাকে জয় করল তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়ে যায়।

ধারাকে একদিন সে তার মনোভাব ব্যক্ত করল। ধারা সঙ্কেতময় স্পর্ধার দৃষ্টি তুলে তারপানে তাকাল। একটা যেন কুৎসিত আভাস আছে সেই সঙ্কেতে। কল্যাণের চোখে অপ্রীতিকর ঠেকল।

মুক্তি নয়, বন্ধনকে অটুট করতে চাইল ধারা। সে তার সন্তানের

জননী হতে চলেছে। ধারালো ছুরির ফলা বসিয়ে দিল কল্যাণের হৃদপিণ্ডে। তার মুখখানা রক্তহীন আর বিবর্ণ হয়ে গেল।

ধারার মুখে হাসি ফুটে উঠল। উল্লাসেব হাসি। জয়ের উল্লাস। সে রীতিমত স্পর্ধার সঙ্গে যেন তার গলায় পাথর হয়ে ঝুলতে চায়। আজীবন তাকে এক অন্ধকাব কাবায় বন্দী করে রাখতে চায়। মুক্তি সে তাকে দেবে না।

কল্যাণেব সঙ্কল্প কিন্তু অতিরিক্ত হিংস্র আর নির্মম। ধারার সাধ্য কি তাকে টলায়। তাব সাধ্য সাধনা, চোখেব জল তার সকাতর আর্তনাদ কিছুই তার সঙ্কল্পকে বিচলিত করতে পারল না। নিরুপায় ধারা তাকে অবশেষে অনুবোধ জানাল, তাকে ধর্মমতে বিবাহ করে তাব অনাগত সন্তানকে তার পিতৃত্বের পরিচয় দিতে।

তাব হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই বোধ হয় কল্যাণ তার শেষ প্রস্তাবে সম্মত হলো।

গভীর রাত্রে, শহব থেকে দূবে এক জনবিরল মন্দির চত্বরে মন্দিরের পুবোহিত এবং কল্যাণের কয়েকজন বিশ্বস্ত বিপ্লবী অনুচরের সামনে তাদের বিবাহ হল। কিন্তু বিবাহ শেষ হবাব অব্যবহিত পরেই পুলিশ মন্দির ঘেরাও করে তাদের আক্রমণ করল। পুলিশের সঙ্গে তাদের সঙ্ঘর্ষ বাধল। দুপক্ষে গুলি চলল। গুলি চালাতে চালাতে কল্যাণ রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুবোহিত, ধারা এবং আরো কয়েকজন ধরা পড়ল। ধারাকে তিনমাস পুলিশের হাজতে থাকতে হয়। ইতিমধ্যে একটা বেলস্টশনে কল্যাণ ধরা পড়ে এবং বিচাবে তার সাতবছর কারাদণ্ড হয়।

সেই বিচারে সরকার পক্ষে সাক্ষী দিয়ে ধারা অব্যাহতি পায়।

গর্ভবতী ধারা হাজত থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়াল। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল নারী অজানা দেশেব অচেনা পথে একা পাড়ি দিল।··

চলার বিরাম নেই। পথের ও শেষ নেই। গা ভাসান দিয়ে সে কলকাতায় এসে উঠল।

…তারপর নিজের বোঝা শুক্তিকে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ও নিশ্চিন্ত হলো।

কল্যাণ তখন জেলে। তার কোন খবর রাখল না ধারা।

দেশ স্বাধীন হলো। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে অনেক কয়েদীর সঙ্গে কল্যাণও মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই মুক্তি পেল। ‥

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে তুজনের সাক্ষাৎ ঘটল সেদিন শুক্তির বাড়ির দোরে। দূর থেকে তাকে চিনতে পেরেই কল্যাণ গম্ভীব ও অবাক হয়ে গেল। কাছে আসতেই সে গাম্ভীর্য আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। ধারার প্রতি তার মনের অবশেষটা ছিল অত্যন্ত ঘোলাটে ও পঙ্কিল। অনেকটা ঘৃণার ও আক্রোশের। বিরক্তি ও অনুশোচনার। তাই তাব আকস্মিক আবির্ভাবে তার ভিতরে একটা উন্মাদ শিখা জ্বলে উঠল। আত্মসংযম করা কঠিন হলো। তা ছাড়া, তার তারুণ্য, তাব ফুলন্ত স্বাস্থ্য, তার সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব, তার পরিপাটি বেশবাস, বিন্যস্ত ঢেউ তোলা ঘন কালো চুল তাব চোখে জ্বালা ধবাল। এই সব ধারালো অস্ত্র দিয়েই সে অতীতে তাকে জয় করেছিল। আর কিছু তার মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু তার কামনাময় যৌবনের অতৃপ্ত ক্ষুধা। তার সতেজ ইন্দ্রিয়ের অস্থিব অঙ্গভঙ্গি। তার অবচেতন মনে তার সেই পরিচয়ই মুদ্রিত হয়ে ছিল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। তাই সে পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

সেই পুবোনো পাপ নিয়ে দীর্ঘদিন পরে ধারা তার সামনে আসতেই তার রক্ত ঘৃণা ও ক্রোধের বিদ্যুৎ দাহে জ্বলে উঠল। সেখানে যে ধারার অন্য কোন প্রয়োজন থাকতে পারে সে কথা সে ভাববে কেমন করে ?

সে ক্ষিপ্তের মত তাকে অপমানে বিধ্বস্ত কবে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। ·

॥ ছয় ॥

নিজের অধিকারের জোরেই কল্যাণ ধারাকে অপমান করতে পেরেছিল। কিন্তু সে এ বাড়ির পরিচিত জানতে পেরে নিজের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণে লজ্জিত হয়ে উঠল। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। শুক্তির পরিচিতা সে। হয়তো বা তার অনুগৃহিতা। হয়তো তার সঙ্গেই সে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। কল্যাণ তার মুখের উপর দোর বন্ধ করে দিল। কোন অধিকারে? শুক্তির কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল। নিজের স্ত্রী ধারার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করবার অধিকার তার থাকতে পারে কিন্তু এ বাড়ির অতিথি ধারাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবার অধিকার তার নিশ্চিত নেই। কোন যুক্তি দিয়েই নিজের এই তুর্বিণীত আচরণকে সে সমর্থন করতে পারে না। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজে লজ্জিত হল। অনুতপ্ত হল। এই ধরণের ঔদ্ধত্যের জন্য কল্যাণকে জীবনে অনেক তুর্ভোগ সইতে হয়েছে। নিজেকে শাসনও করেছে বহুবার। তবু সে শোধরাতে পারে নি। পরম মুহূর্তে সে অসাবধানে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

তুর্ভাবনায় মন তার শঙ্কিত হলো। হয়তো শুক্তিকে সে আঘাত করেছে।

ঘুম এলো না। আধেক রাত বিনিদ্র নয়নে সে বিছানায় পড়ে ছটফট করল। শেষে বিছানা ছেড়ে ঘরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগল। দীর্ঘদিন পরে ধারা যেন তাকে ব্যঙ্গ করে গেল। ধারা। ধারা। তার চক্ষুশূল ধারা। তার বিবাহিত স্ত্রী বলেই সে পরিচয় দেবে শুক্তির কাছে। তার অধিকার দাবি করবে।

মনে পড়ল তার গর্ভস্থ সন্তানের কথা। কে জানে সে ও হয়তো গোকুলে বাড়ছে। হয়তো সোহাগিনী সেই সুসংবাদই সর্বাগ্রে তার

কর্ণগোচর করতো, সুযোগ পেলে। তার স্ত্রী, তার সন্তান মিলে একটি সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ সংসারের দায়-দায়িত্ব তারি স্কন্ধে আরোপ করতে এসেছিল।

কল্যাণ কোমলহৃদয় বা ভাবালু নয়। তবু একটা ভাবের উচ্ছ্বাস যেন তার জীবনের মরুমাঠকে হঠাৎ সিক্ত করে দিল। তার প্রকৃতি রুক্ষ পাহাড়ের মত শুকনো খটখটে। শষ্পাবরণের স্নিগ্ধতা নেই। কোমলতা নেই।

শেষরাত্রের মেঘমেত্বর আকাশের পানে চেয়ে তার মনটা হঠাৎ ভিজে উঠল বাৎসল্যের মধুর রসে। সন্তানের কথা সে বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আজ তার স্মরণে আসতেই তার কল্পনার আকাশে জ্বল জ্বল করে উঠল একখানি কচি মুখ। নিমুর মত হাসিভরা সুন্দর সুষ্ঠু মুখ। সে তার সৃষ্টি। তার সন্তান।

খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আসন্ন প্রভাতের প্রতীক্ষারত ধরণীর পানে চেয়ে হঠাৎ তার চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এলো। গৃহহারার চোখে গৃহের সুখস্বপ্ন জেগে উঠল। তার স্ত্রী। তার সন্তান। তার সংসার। ভাবতেও তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা বিদ্যুৎপুলক খেলে গেল। তার হৃদয়ের অনাহত তন্ত্রীতে একটা অজানা রাগিণীর মত ঝঙ্কৃত হতে লাগল।

আনন্দময় একটি সংসার। শুক্তির মত স্ত্রী। নিমুর মত সন্তান। তার জীবনকে কমনীয় ক'রে তুলতে পারতো। পাথরের বুকে উৎকীর্ণ করতে পারতো অজন্তার সৌন্দর্য সুষমা।

শুক্তি তার চোখে অনন্যা। নির্মাল্য দেবশিশু। নির্মাল্য তার জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তার কঠোরতার উপর কোমল শষ্পের আচ্ছাদন দিয়ে তাকে অনেক শান্ত ও মোলায়েম করে তুলেছে। তার হিংস্রতাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে।

করুণ বিষণ্ণমূর্তি শুক্তি। যেন রাতের ফুল। রাত পোহাবার আগেই শিশিরের ভারে ঝরে পড়ল। সম্পূর্ণ ফুটতে পেল না। শুক্তির

পানে চোখ তুলে তাকাবার সাহস নেই কল্যাণের। হোমানল শিখার মত ওর রূপের জ্যোতি তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তার গায়ে আঁচ লেগে তাকে কাঁপিয়ে তোলে। তাকে মিথ্যা করে দেয়।

শুক্তির মাঝে সে সত্যের আলো দেখেছে। যে আলো এতদিন তার চোখে পড়েনি। যে সত্যকে উপলব্ধি করবার মত এতদিন তার শক্তি ছিল না। হৃদয় ছিল না। শুক্তির সংস্পর্শে এসে সে নতুন চোখ পেয়েছে। নতুন দৃষ্টিলাভ করেছে। তপস্বিনী সে। এত সম্পদ সমারোহ, তবু সম্ভোগের বাসনা নেই। ভরা যৌবন, তবু এতোটুকু চাঞ্চল্য নেই। এতো রূপ দেহে তবু চোখ মেলে চায় না দেহের পানে। কোন কিছুতেই তার আসক্তি নেই। কোন কিছু চায় না সে। না চেয়েই সব কিছু পেয়েছে সে। পেয়ে সে নিজেকে ভোলে নি। ভোলে নি বলেই নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছে। তার রূপ যেন অনির্বাণ দীপশিখার মত তার সংসারকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

মেঘ ঘোর করে এলো। নতুন করে অন্ধকার জমাট বাঁধলো। শেষরাতের ঠাণ্ডা বাতাস কল্যাণকে কাঁপিয়ে তুলল। জোরালো ধারায় বৃষ্টি নামল।

জানলা বন্ধ করে কল্যাণ বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। সামনের বাগানে গাছের পাতায় অবিশ্রাম ধারাপতনের ঝম ঝম শব্দ তার উপবাসী অন্তরের অনন্ত শূন্যতাকে মথিত ও উতরোল করে তুলল। বাদল বায়ুর দাপটের মত একটা চাঞ্চল্য তার উদাস মনকে অস্থির করে তুলল। অথচ বুঝতে পারে না কিসের এই অস্থিরতা। মন কি চায়।

অন্দরের সবচেয়ে বড় ঘরখানা শুক্তির শোবার ঘর। ঘরের মাঝে মেহগেনির বিরাট খাট। শ্বাশুড়ীর খাট। শিশুকালে সমর মায়ের পাশে সেই খাটে ঘুমিয়েছে। সাজানো ঘর। সংলগ্ন পাশের ঘরে

আলমারী ড্রেসিং টেবিল, আলনা। আরেক পাশের ঘরে কৌচ সেটি আর টিপয় দিয়ে সাজানো। ঝরঝরে তকতকে ঘর। বিচিত্র মোজেক করা মেঝে। ভোগের অজস্র উপকরণ। শুক্তির অন্তরের ভোগী মেয়েটি কিন্তু তার স্বামীর হাত ধরে অন্তর্হিত হয়েছে। যে আছে সে যোগী সে দুশ্চর তপস্বিনী। ভূমি শয্যা তাব রাতের বিশ্রাম। ভিতবের মা শুধু তার সজাগ আর সব প্রবৃত্তিগুলো ঘুমে অচেতন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেই সে সুষুপ্ত রাত্রি যাপন করে। রাতের কামনা হয়েছে মন থেকে অপসৃত। বিস্মৃত হয়েছে রাতের প্রত্যাশার ভীরু অভিলাষ! দৃষ্টি থেকে লুপ্ত হয়েছে আসঙ্গ লিপ্সার অঞ্জন! দেহ থেকে নিঃশেষ হয়েছে তীব্র যৌবনাবেগ। সব শান্ত। সব কোমল। অধীরতা আকুলতা নেই।

ঝড় বৃষ্টির দাপটে শুক্তির ঘুম ভেঙ্গে যায়। শেষ রাতেব বৃষ্টি ঘুমকে আরো ঘোরালো করে তোলে। আবাম অলস দেহকে আকড়ে ধরে। মনে নেশা ধরে।

শুক্তির ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল কল্যাণ আর ধাবার কথা। তাদেব ইতিবৃত্ত জানবার কৌতূহল তার চেতনা জুড়ে উদ্দাম হয়ে আছে কাল থেকে। সেই কৌতূহলই যেন তাকে ঘুম থেকে তুলে দিল। সে আচ্ছন্নের মত শুয়ে শুয়ে তাদেব কথাই ভাবতে লাগল। তার মনে বদ্ধমুল ধারণা জন্মেছে যে ধারা তাদের সম্পর্কটা গোপন করতেই চেয়েছিল, নইলে সে তার সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতো না। আব কল্যাণ ও 'আপনি ব্যথা পাবেন' বলে কথাটা চেপে গেল। কিন্তু তাতেই তো তার কৌতুহল নিবলো না। বরং আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। কেনই বা কল্যাণ তাকে অমনভাবে বিদায় করে দিল।...তার উপর কিসের আক্রোশ?

ঘুমন্ত নিমু কুঁকড়ে গুটিয়ে তার কাছ ঘেঁসে এলো। স্তনপায়ী শিশুর মত তার কবোষ্ণ কোমল বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল। শুক্তি তাকে আঁচলের ভিতর টেনে নিয়ে গভীর আরামে তার রেশমের মত

চুলের উপর মুখ ডুবিয়ে দিল। ছেলেটা পশু শাবকের মত তার বুকের উপর মুখ রগড়াচ্ছে।

শুক্তির হাসি পায়। তার মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে বলে, ও কি রে, খাবি নাকি?

নিমু স্তনদুটিকে হাত দিয়ে খাবলে ধরে। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করে বলে, কী খাবো? দুধ আছে নাকি?

তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে শুক্তি হাসতে হাসতে বলে, থাকলে খেতিস্, না? বুড়ো খোকা এ-দুটোকে আর ভুলতে পারছো না? ভারি মিষ্টি লাগে।

—ভারি মিষ্টি। রসগোল্লার চেয়ে, দুধ ভাতের চেয়ে অনেক মিষ্টি।

শুক্তি হেসে বললে, ভারি দুষ্টু হচ্ছিস। ছাড়।

ছাড়বে কি, সে একটাকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে, আরেকটাকে দিব্যি মুখে পুরে দিল।

—ও কি রে, ছাড ছাড়। আমি তোর মাষ্টারকে বলে দোব।

—ধেৎ! মাষ্টারকে আবার কি বলবে। ছিঃ!

একটু থেমে শুক্তি জিজ্ঞেস করলে, মাষ্টারকে তুই ভয় করিস?

নিমু বললে, দুর! ভয় করবো কেন? মান্যো করি।

—তাই বুঝি? আর কাকে মান্য করিস?

—কেন তোমাকে। আর সব গুরুজনদের।

একটু থেমে, কি ভেবে শুক্তি জিজ্ঞেস করলে, তোর মাসিমাকে?

—মাসিমা কি গুরুজন নাকি?

—গুরুজন নয়? বয়সে বড়ো—

নিমু বললে, তুমি যদি গুরুজন বলো আমি মান্য করবো। কিন্তু মাসিমা আর এখানে আসবে না।

—কেন? কে বললে?

—কেউ বলেনি। মাষ্টার মশায়ের ভয়ে।

ধারা আর কল্যাণ আবার তার বুকের তলায় ফেনিয়ে উঠল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল।

বিছানার উপর উঠে বসলো নিমু।

—এখুনি উঠলি কেন রে? বিষ্টি পড়ছে যে।

—পড়ুক না। আমি তো বিষ্টিতে ভিজবো না। পাঁচটা বাজলেই বিছানা থেকে উঠতে হয়। বই-এ লেখা আছে: গেট্ আপ অ্যাট্ ফাইভ। গো টু বেড্ অ্যাট্ নাইন্।

—ও:! তাই বুঝি? আর কি লিখেছে বইয়ে?

শুক্তি তাকে বুকের কাছে টেনে নিল।

নিমু দম দেওয়া গ্রামফোনের মত গড় গড় করে মুখস্থ বলল, ইফ ইউ উইস্ টু বি স্টাউট অ্যাণ্ড ষ্ট্রং, গেট্ আপ্ অ্যাট ফাইভ। গো টু বেড্ অ্যাট নাইন্। কিপ্ ইয়োর স্কিন্ ক্লিন্। ব্রীদ্ পিওর এয়ার···

হাসতে হাসতে শুক্তি ও বিছানায় উঠে বসলো। বললে, তা হলে তো উঠতেই হয়। বই-এ যখন লেখা আছে।

নিমু মরুব্বির মত মাথা নেড়ে বললে, তবে তো স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

বাইরের জানলা খুলে দাঁড়াল শুক্তি। বৃষ্টির তোড় কমেছে। মেঘলা আকাশ ফর্শা হয়েছে।

ভিজে মাঠ। বাদল হাওয়া। নিমু মাষ্টারের সঙ্গে মাঠে আজ আর খেলতে নামেনি। মাঠের সামনে ঢাকা বারান্দার নিচে বসে কল্যাণ খবরের কাগজ পড়ছিল।

শুক্তি ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। তাকে দেখেই কল্যাণ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

মৃদু হেসে সে তাকে চোখের ইঙ্গিতে বসতে বলল। ধীর পায়ে এগিয়ে এলো একটি নির্ধূম শিখার মত।

কাছাকাছি এসে শুক্তি কল্যাণকে প্রশ্ন করল, ধারার কলকাতার ঠিকানা জানেন মাষ্টার মশাই?

শুক্তির মুখের পানে চেয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে বললে, না, তো। কেন, আপনি জানেন না? আমিই আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলুম।

ঠোঁট মুচড়ে হাসলো শুক্তি। ভ্রূভঙ্গি করে মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি জানলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে আসবো কেন?

কল্যাণ অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করলে।

শুক্তি তার মাথার উপর হাসল। চাপা কৌতুকের কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তার ঠিকানা জেনে কি করবেন?

মাথা না তুলেই কল্যাণ উত্তর দিল, আপনি আদেশ করলে আমি নিজে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসবো।

—আপনার ডাকে সে আসবে?

মাথা তুলে তাকাল কল্যাণ। তার চোখে চোখ রেখে বললে, প্রয়োজন হলে আপনার জন্যে, তার ক্ষমা চাইতে হবে। সাধ্য সাধনায় তাকে তুষ্ট করতে হবে।

—তাতে আপত্তি নেই?

—আপত্তি থাকলে চলবে কেন? আমার অপরাধ যে আপনার কাছে। আপনার অতিথির অসম্মান আপনারই অসম্মান। আপনার সম্মান বাঁচাবার জন্যে আমাকে সব কিছু করতে হবে। আমার নিজের সম্পর্কটা সেখানে বড় নয়।

একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে শুক্তি একখানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তারপর উর্ধ্বশ্বাস গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করল, জানতে পারি না সে সম্পর্কটা কি?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কল্যাণ তার মুখের পানে খানিক চেয়ে রইল, তারপর নম্র হাসিতে মুখভরে বললে, আপনার মুখ চোখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাত্রে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এই দুরন্ত কৌতূহল।

—মিথ্যে নয়। জানেন তো মেয়েলি কৌতূহল কি বিশ্রী।

—জানি বলেই তো বলছি।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কল্যাণ চাপাগলায় সঙ্ক্ষিপ্ত উত্তর দিল, ধারা আমার স্ত্রী বলেই পরিচিত।

—আপনার স্ত্রী? ধারা আপনার স্ত্রী?

শুক্তির কণ্ঠে যে সুর ধ্বনিত হলো এবং মুখে চোখে যে ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তা শঙ্কাবিজড়িত প্রচণ্ড বিস্ময়ের।

বাক্যহীন স্তব্ধতায় মুখ ঝুলিয়ে ভাবতে বসল শুক্তি।

কল্যাণ বিস্মিত হলো তার ভাবান্তরে। মনে হলো যেন তাকে সে অতর্কিতে আঘাত করেছে। এবং আঘাতটা তীব্র হয়ে তার মর্মে গিয়ে বেজেছে।

খানিক পরে কল্যাণ মুখ তুলে সহাস্যে প্রশ্ন করল, কী ভাবছেন? আমার কথা তো আপনি জানলেন। এইবাব আপনি বলুন, ধারার সঙ্গে আপনার কিসের আত্মীয়তা?

দাবির মত শোনালো তাব প্রশ্নটা। চমকে মুখ তুলে চাইল তার পানে! আত্মসংবরণ করে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে শুক্তি বললে, কোন আত্মীয়তা নেই আমাব সঙ্গে। পথের আলাপ। বান্ধবী। এখানে আসা যাওয়া আছে।

মুখ নিচু করে কল্যাণ বললে, ঈশ্বর রক্ষে করেছেন। আমি ভেবেছিলুম বৈবাহিক সূত্রে হয়তো আপনাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা গজিয়ে উঠবে।

চোখে ঝিলিক দিায় শুক্তি জিজ্ঞেস কবলে, ভয় পেয়েছিলেন নাকি?

—তা এবটু পেয়েছিলুম বই কি!

- ভয় কাটবার মতো কোন আশ্বাস তো আমি দিতে পারবো না। এ বাড়ির সঙ্গে একটা মধুর সম্বন্ধ হলো। ধারা আমার বোনের মতন। আমাকে দিদি বলে। কিন্তু ছাড়াছাড়ি আপনাদের কতদিনের?

—বহুদিনের। ছ' সাত বছর হবে বই কি?

—কারণ?

গম্ভীর হয়ে গেল কল্যাণ। ঢোঁক গিলে বললে, কারণ আসলে আমাদের মিলনটা মিথ্যে। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল শুক্তি বাইরের বর্ষণক্লান্ত আকাশের পানে। শূন্য উদাস দৃষ্টিতে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তুপক্ষের সততায় মিথ্যেও সত্যি হয়।

আঁচলটা মাথায় টেনে দিয়ে সে ভিতরে যাচ্ছিল। কল্যাণকে চা দিতে এলো রমা।

শুক্তি হাসতে হাসতে আড়চোখে কল্যাণের পানে চেয়ে রমাকে বললে, মাষ্টার আমাদের কে জানিস ?

—কে ?

রমা কল্যাণের পানে তাকাল উৎসুক চোখে।

—ধারাব বর।

—মাষ্টারের বিয়ে হয়ে গেছে ?

রমার হাত থেকে গরম চা সমেত কাপ ও সসারটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার মুখের চেহারা দেখে শুক্তি হাসি চাপতে পারল না। মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে হাসতে সে ক্ষিপ্র পায়ে ভিতরে চলে গেল।

কল্যাণ রমাকে মুখ ভেংচে গুম হয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে এক ঝলক হাসল।

জলভরা চোখে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে রমা বারান্দা থেকে ভিতরে চলে গেল।

অপরাহ্নের অশ্রান্ত ধারা বর্ষণের সুরে সুর মিলিয়ে কল্যাণ শুক্তির কাছে সবিস্তারে বিবৃত করল তার জীবনেতিহাস। শুক্তিকে শোনালো ধারার সঙ্গে তার অপরিহার্য মিলনের অপ্রিয় কাহিনী। ধারার প্রমত্ত যৌবনের স্রোতাবেগে তার অসহায় আত্মবিলুপ্তি। উদঘাটিত

হলো কল্যাণের বিচলিত চিত্তের বিসদৃশ নিগূঢ় রহস্য। কোন কথা সে গোপন করল না। নিজ মুখে ব্যক্ত করল নিজের ঔদ্ধত্যের, হিংস্রতার ও স্বেচ্ছাচারিতার চাঞ্চল্যকর ইতিবৃত্ত। বিধবা মায়ের একমাত্র অবলম্বন। মায়ের মনে মর্মান্তিক আঘাত হেনে মাকে সে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

ধারা তাঁর অপমৃত্যুর সত্য কারণ।

কল্যাণের জেল হওয়ার অব্যবহিত পরে ধারা যায় তার গ্রামের বাড়িতে। মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের পরিচয় দেয়। বলে, গর্ভে তার কল্যাণের সন্তান।

বীরব্রত, ব্রহ্মচারী পুত্রের এই অধঃপতনের অপ্রত্যাশিত আঘাত মা সহ্য করতে পারলেন না। মনঃপীড়ায় ও লোকলজ্জায় আত্মহত্যা করলেন অভাগিনী।

কল্যাণ তখন জেলে।

কল্যাণ বিবৃতি শেষ করে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে শুক্তির পানে মুহূর্ত তাকাল। জীবনটাকে শুষে নিয়ে যেন খোসাটা ফেলে দিয়েছে এমনি তার মুখ।

শুক্তির চোখে পড়ল তার রক্তঝরা হৃদয়ের ক্ষতের মূলটা। তারও চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

আগুনের শিখার মত একটা লকলকে বিদ্যুৎ ঘরখানাকে চকিত করে তুলল। কাছেই কোথায় একটা বাজ পড়ল। বাড়িখানা কেঁপে উঠল। শুক্তি ত্রাস্তে উঠে ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে ভিতরে গেল! ঘুমন্ত নিমু হয়তো ভয়ে আঁতকে উঠবে।

এমনি একটা অগ্নিময় বাজ তার বুকে এসে পড়ুক। তারি প্রতীক্ষায় যেন কল্যাণ চোখ বোঁজে।

শুক্তি নিজের ঘরে ফিরে এসে আঁচলে চোখ মুছলো। কিন্তু অবাধ্য চোখ তার আকাশের অবিশ্রান্ত বারিধারার মতই বারংবার অশ্রুপ্লাবিত হয়ে উঠল। পরের জন্য অশ্রুপাত করা পরের ব্যথায় বেদনাবোধ

করা শুক্তির স্বভাবের একটা অঙ্গ। কিন্তু এ যেন একটা নতুনতরো চেতনা। একটা অভূতপূর্ব অচিন্ত্যনীয় অনুভূতি। সুখের মত অদ্ভুত একটা ব্যথা। করুণা মিশ্রিত একটা ব্যাকুলতা। পরের দুঃখমোচনের ঔৎসুক্য।

ব্যথার উপলব্ধি তার গভীর। অন্তরের গভীরে তার রক্তাক্ত ক্ষত। প্রেমের জন্য সে জীবনপাত করেছে। নিজেই যেন একটি ব্যথার সুর। তার হাসির নিচে অন্তহীন বেদনার অতলতা। তার স্বল্পপরিসর বিবাহিত জীবন একটি ভয়াবহ শোকান্তক নাটক। তবু তার মনে হলো কল্যাণের তুলনায় সে সুখি। ওর জীবনের কোন আশা আশ্বাস নেই। পায়ের নিচে মাটি নেই। জলের তোড়ে ভেসে বেড়ানো ছাড়া গতি নেই।

কল্যাণ বিপ্লবী। কল্যাণ দুঃসাহসী যোদ্ধা। কল্যাণ দেশপ্রেমিক। দেশের স্বাধীনতার জন্য সে প্রাণপাত করেছে। দেশব্যাপী অকল্যাণের বিরুদ্ধে কল্যাণ বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। কারাবরণ করেছে। সর্বস্বান্ত হয়ে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছে। কল্যাণ মহাপ্রাণ। ধারা তার সংযমকে টলিয়ে দিয়েছে! তাকে হয়তো বা পথভ্রষ্ট করেছে।

তার বৈচিত্র্যপূর্ণ বেদনাময় জীবন ইতিহাস শুক্তির মনে ছায়াপাত করেছে। শুক্তির কাছে তার জীবনের সব চেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সে নিমুর জন্মদাতা। কল্যাণ না জানলেও সে নিঃসংশয়। নিমুর চেহারায় তার প্রতিবিম্ব চোখে পড়েছে। এতদিন যা অগোচর ও অপ্রত্যক্ষ ছিল আজ তার চোখে তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে।

এ যেন দৈবের ঘটনা। নিমুই যেন তাকে এখানে টেনে এনেছে।

শুক্তির চোখে এ এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার।

বিস্ময়ের ধাক্কায় সে বিভ্রান্ত ও হতচেতন।

নিছক দৈবের চক্রান্ত। পিতা পুত্রকে চেনে না। পুত্র পিতা চেনে না।

শুক্তি যেন শূন্যে দুলছে। বুকের ভিতর দুলে উঠছে একটা

অশ্রুর উচ্ছ্বাস। তার জীবনে যেন একটা পরিবর্তন ঘনিয়ে আসছে। তারি প্রতীক্ষায় সে রুদ্ধশ্বাস।

চিনতে পারলে কল্যাণ কি নিমুকে দাবি করবে নাকি ?

শুক্তির বুভুক্ষিত বাৎসল্য আশঙ্কায় উদ্বেগে কেঁপে ওঠে। সে অশ্রুসজল কালো চোখে নিমুর পানে চায়।

তার চোখদুটো জ্বলে ওঠে। মার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নেবে। কাব সাধ্য ?

নিমু কিন্তু কল্যাণের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে উঠেছে। দুজনের প্রীতি ও ভালবাসার চেহারাটা কল্পনা করে শুক্তির বুক কেঁপে ওঠে। পাঁজব দুলে ওঠে। সারাদিনেব কতটুকু সময় নিমু তার কাছে থাকে। সর্বক্ষণই তো কল্যাণেব কাছে। বাগানে মাঠে একসঙ্গে ছুটোছুটি খেলা। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাওয়া, প্রার্থনা পাঠ ও আবৃত্তি। কল্যাণ নিজেকে ভুলে যায়। নিমু তাব হাত ধবে তাকে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কল্যাণ গাছেব আড়াল থেকে 'কু' দেয়। নিমু তাকে টেনে বের করে আনে।

কল্যাণের প্রাণখোলা হাসি দেখে শুক্তিব শবীবে রোমাঞ্চ জাগে। কল্যাণ আসার পর নিমুর স্বাস্থ্যেব উন্নতি হয়েছে। সে অনেক দুরন্ত আব অনেক শান্ত হয়েছে। অনেক ভব্য অনেক নম্র। কথাবার্তা চলাফেবার পর্যন্ত ভোল বদলে গেছে।

আসলে তাবা দুজনে দুজনকে চিনেছে। বুঝেছে। চোখের ইঙ্গিতেই তাদেব সব বলা হয়ে যায়। মুখ ফুটে কথা বলতে হয় না।

নিমু তার একান্ত বশীভূত হয়ে পড়েছে।

আজকাল আবার মাষ্টারের সঙ্গে খেতে বসে। শুক্তিব চোখে একটা হিংস্রতা ফুটে ওঠে। নিজেকে কেমন বিপন্ন মনে হয়। মাষ্টার তাকে তার কাছ থেকে তিলে তিলে সরিয়ে নিচ্ছে।

তার রক্ত তাকে কাছে ডেকে নিচ্ছে।

এ রক্তের ডাক। কল্যাণের সতেজ রক্ত তার ধমনীতে। কল্যাণ তাকে না চিনলেও তার রক্ত তাকে চিনেছে বই কি। কল্যাণের বলিষ্ঠ পৌরুষ, কল্যাণের অমিত সাহস, কল্যাণের ত্যাগ নিমুর প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। সে কল্যাণের প্রতিবিম্ব।

শুক্তির মনে হয়, নিমু কল্যাণের। ওর কাছ থেকে তাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার কোন সম্বন্ধ নেই নিমুর সঙ্গে। সে একেবারে অনধিগম্য। ভাবতেও শুক্তির বুক কেঁপে ওঠে। এ কথা সে মানতে চায় না। নিমুর উপর তাব অখণ্ড অধিকার। হৃদয়ের অধিকার। ফোঁটা ফোঁটা বুকের তপ্ত সুধা পান কবিয়ে সে তাকে মানুষ করেছে। সে তাব। সে নিমুর মা। তার বুকদুটো টনটন করে ওঠে। জরায়ুটা মুচড়ে ওঠে। কল্যাণের অনস্বাকার্য পিতৃত্বেব পাশে নিজেকে নিমুর মা কল্পনা করতে তার সর্বশরীর লজ্জায় ও ভয়ে কণ্টাকিত হয়ে ওঠে।

কল্যাণ বলে, ধারা সম্বন্ধে আপনাব কি আদেশ জানালেন না তো?

শুক্তি জবাব দেয়, কেন, অনুশোচনা হচ্ছে না কি? নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন?

—ভুল নয়। অপরাধ। আপনার কাছে আমি অমার্জনীয় অপরাধ করেছি। সেই অপরাধের প্রতিকার করবার একটা সুযোগ আমাকে দিন।

হাসলো শুক্তি মৃদুরেখায়। বলল, না, আমার কাছে কোন অপরাধ করেননি। আচরণটা তবে সহজ সৌজন্য বিরোধী। নিজেকে হাবিয়ে ফেলেছিলেন।

—নিঃসন্দেহ।

কল্যাণ অপরাধীব ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল।

শুক্তি বললে, ঠিকানা জানা থাকলে আপনাকেই পাঠিয়ে দিতুম তাকে আমন্ত্রন করে আনতে। কিন্তু তা যখন জানা নেই—

—জানা না থাকলেও, জানতে কতক্ষণ ?

—কলকাতার মত শহরে ? আপনি কি গোয়েন্দা নাকি ?

দুজনেই হাসল।

কল্যাণ বললে, কষ্টসাধ্য হলেও দুঃসাধ্য নয়। আপনার মনে যদি কোন অস্বস্তি থাকে,—

শুক্তি বলে উঠল, না। আমার মনে হয় সে নিজেই আসবে কিংবা কোন খবর দেবে। চুপ করে সে থাকতে পারবে না।

কল্যাণ আশ্বস্ত হলো মনে মনে।

শুক্তি তেরছা চোখে কটাক্ষ হেনে তাকে প্রশ্ন করল, কিন্তু দুজনের মাঝের এই বিচ্ছেদটার কি অবসান হবে না?

শুক্তির কণ্ঠে অভিভাবকের সুর। কল্যাণ নিঃশব্দে তারপানে চোখতুলে একবার তাকাল। অপরূপ ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি। তার তনু দেহ যেন ফুলন্ত লতার মত হাওয়ায় দুলছে। কালো চোখের দীর্ঘপল্লবগুলি তুলে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারপানে। এ যেন তার দৈব আর্বিভাব। ধ্যানের রূপ। মুহূর্ত দেখেই চোখ বুঁজতে হয়।

কল্যাণ বুঝতে পারলে না, কী সে বলবে। কি বললে সঙ্গত হবে। সে সম্মোহিতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুক্তি কিছুক্ষণ পরে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, কী, কথা বলছেন না যে ? বলুন।

শক্তি সংহত করে কল্যাণ বললে, সব তো আপনাকে বলেছি। আর তো বলবার কিছু নেই।

হাসল শুক্তি। মধুর হাসি। বললে, বলা শেষ হয়েছে। বিরোধের কথাই তো শুনলুম। কিন্তু সন্ধির কোন প্রতিশ্রুতি তো পেলুম না।

কল্যাণ আর একবার তার মুখের পানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

কল্যাণ কোন কালেই লাজুক নয়। সে মুখর। সে স্পষ্টবক্তা। কতকটা দুর্মুখ। কিন্তু শুক্তি যেন তাকে অবশ ও মূক করে দিল।

শুক্তি দৃঢ় কম্পিতস্বরে বললে, জীবনকে প্রত্যাখ্যান করবেন না মাষ্টার মশাই। হতাদরে ফিরিয়ে দেবেন না। জীবনকে সাধ্যসাধনা করতে হয়। স্তবস্তুতি করতে হয় তবে কৃপাদর্শন মেলে। নিজেদের ভুলে জীবনকে মরুভূমি করবেন না। যা ঘটেছে নিজেদের ভুলে ঘটেছে। সেই ভুলের কঙ্কালকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন না। নতুন করে জীবনকে গড়ে তুলুন। দুজনের মিলিত জীবনে ফুল ফোটান।

তন্ময় হয়ে কল্যাণ শুনছিল তার কথাগুলো। কথা তো সে নয়। সে গান। একটা অশ্রুত রাগিনীর ঝঙ্কারের মত কথাগুলো তার উদ্বেল অন্তরের অন্তস্তলে ধ্বনিত হচ্ছিল। সে জবাব দিয়ে এই মধুর সুরটিকে বন্ধ করতে চায় না। সে শুনতে চায়। বলতে চায় না। শুক্তিকে বলাতে চায়। অপূর্ব তার বলার ভঙ্গি। ঘরোয়া কথা এমন মোলায়েম আর এতো মধুর করে বলতে বুঝি আর কেউ পারে না। তার মনে ঘোব লাগে।

শুক্তি দৈবাৎ সচেতন হয়ে প্রসঙ্গটা শেষ করবার মানসেই যেন ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে উঠলো, সে আসবেই। না এসে সে থাকতে পারবে না।

তার অধরে একটা দুর্বোধ হাসি ফুটে উঠলো। সে মাথা দুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ সাত ॥

ধারা কিন্তু আর এলোনা।

দিন গেল, মাস, কাটল। বর্ষার অঝোর কান্না শেষ হলো। শরৎ এলো সাদা শাড়ির আঁচল দুলিয়ে। কাশ বনের ভিতর দিয়ে হাসির হিল্লোল তুলে ফুল বিছানো শিউলি বনে। দেখতে দেখতে শীতের রুক্ষ হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরৎ ও বিদায় নিল। শীত এলো গাছপালা নিষ্পত্র করে। শ্যামলতার বুক জ্বালিয়ে।

ধারা এলো না।

কেন এলো না সেই জানে। শুক্তির মন বলে এতদিন যখন এলোনা, হয়তো আর আসবে না। কিন্তু নিমুকে সে ভুলে গেল কেমন করে?

কিসের নেশায়?

নেশা কি মানুষের একটা? বহুবিচিত্র মানুষের মন। ক্যালিড স্কোপের মত সঞ্চরণশীল। জঙ্গম। অস্থির। এতটুকু ধাক্কার ভর সয় না। একচুল এদিক ওদিক হলেই প্রকাশ হবে তার বিভিন্ন রূপ। বদলে যাবে রীতিনীতি। পরিচয় বদলে যাবে।

ধারাও সেদিন আকস্মিকের আঘাতে ডিবেল হয়ে গেল। সে মুখ থুবড়ে পড়ল। নিজে আর উঠতে পারল না। তাকে হাত ধরে তুলতে হলো। হাত ধরে যার উঠলো, দাঁড়াল তার গলা জড়িয়ে ধরে।

গলা তার শক্ত। ধারার ভার বহন করবার শক্তি ও সামর্থ তার প্রচুর। তাকে গলায় দোলাবার জন্য তিনি ঘাড় উঁচিয়ে ছিলেন। ধারার জীবনের ভার অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই তিনি বহন কর আসছেন ধারার পরিশ্রমের বিনিময়ে। পোষ্য হিসাবে।

ধারার পরিচয় পরিবর্তন হলো। প্রমোশন পেল শরণ থেকে শিথানে। অন্দর থেকে অন্তরে।

ধারা সুযোগ সন্ধানী।

তার মনিব শশিভূষণ মুৎসুদ্দি গর্ভমেণ্টের বড় অফিসার। মাস মাহিনা মোটা অঙ্কের।

স্ত্রী এবং একটি মাত্র কন্যা নিয়ে তার সংসার। স্ত্রী চিররুগ্না। অগোছালো সংসার এবং অনাদৃতা কন্যার ভার নেবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ধারাকে।

তিন বছর আগে ধারা এ সংসারে ছুঁচ হয়ে প্রবেশ করে, চিররুগ্না বধূটির অনুকম্পায়। হৃদ্যতাব জোরে মানুষকে আপন করে নেবার কলা কৌশল জানা ছিল ধারার। তাব উপর সুন্দর মুখের জয় অবশ্যম্ভাবী কাজেই তিনটি প্রাণীর হৃদয় জয় করে নিতে তাব তিন মাস ও লাগল না। সে সংসারে অপরিহার্য হয়ে উঠল। সংসারের ভোল বদলে দিল ধারা। নতুন হাতের সৌন্দর্য ব্যঞ্জনায় সংসার ঝলমলিয়ে উঠল।

অন্তরালবর্তিনী সৌন্দর্যময়ী মেয়েটির নিপুন হাতের সেবা মাধুর্যে মুৎসুদ্দি সাহেবের বিড়ম্বিত জীবনে ঘোব লাগে। কাছাকাছি হলেই বুকের রক্ত চন চন করে ওঠে। ধারার যৌবনের আচ লাগে বোধ হয় তার গায়ে।

পুরুষের চোখে নিজেদের দাম বুঝতে মেয়েদেব বেশী দেরী লাগে না। ধাবার ও বুঝতে বাকি বইলো না।

বিধাতা ও সুপ্রসন্ন। মুখ তুলে চাইলেন ধারার পানে। মুৎসুদ্দি সাহেবের দাম্পত্য জীবনে ছেদ টেনে দিলেন। পতিব্রতা স্বামীর কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলেন।

মাতৃহারা মেয়েটি ধারার বুকে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল। পত্নীহারা মুৎসুদ্দি অসহায় চোখে ধারার পানে তাকাল। লম্বা ছুটি নিলেন পত্নীশোক নিরসনের জন্য। ধারা আর মেয়েকে নিয়ে পাড়ি দিলেন কালিম্পং-এ।

শৈলাবাসের হিমেল হাওয়ায় মুৎসুদ্দির চিড় খাওয়া মনে আবার জোড়-তালি লাগল। চোখে স্বপ্নের ঘোর লাগল। স্বপ্ন আঁকা চোখে নতুন দৃষ্টি দিয়ে তাকাল সে ধারার পানে। ধারার তরুণ দেহের কোমলতায় প্রকৃতি তার সৌন্দর্য সুষমা ঢেলে দিল। মুৎসুদ্দির চোখে সে ভুবনমোহিনীরূপে দেখা দিল।

নতুন করে ঘর বাঁধবার বয়স তার পার হয়ে যায়নি। বয়স তার চল্লিশের কোঠায়। দেহে তার তারুণ্যের অগ্নিচাঞ্চল্য। যৌবন তার অতৃপ্ত। বিড়ম্বিতা ধারার সঙ্গ ও সাহচর্য সেই অতৃপ্তিকে খুঁচিয়ে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। ভোগলিপ্সু করে তুলেছে।

সুযোগ বুঝে ধারার কাছে একদিন প্রস্তাব করল মুৎসুদ্দি।

ধারা যেন প্রতীক্ষা করছিল। সে আশ্চর্য হলো না। সে জানতো। রাঙামুখে অপরূপ ভঙ্গিতে সে চোখ তুলে একবার তাকাল তার পানে। কুমারী মেয়ের মত সঙ্কোচ জড়িত চোখে। দ্বিধাজড়িত কম্পিত অধরে ভেসে উঠলো সূক্ষ্ম হাসিব বেখা। সে হাসিতে তৃপ্তির আবেশ। চোখেব দৃষ্টিতে ঝাপসা তৃষ্ণা।

প্রণয়ীব কাছে মেয়েবা সস্তা হতে চায় না। ধরা দেবার জন্য যখন বুক আনচান কবে তখনো ছুটো ডানাঝাপ্টানি দেয়, তখনো চঞ্চুর আঘাত কবে। নইলে দর বাড়ে না।

ধাবাও সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিল না। 'না'-ও বললো না। দুলুক না দুদিন সংশয়ের দোলায়। উঠুক না আকাঙ্খা উদ্দাম হয়ে। পড়ুক না আরো ক'টা দিন কামনার তপ্তশ্বাসে।

পুরুষের মনে ঝড় তোলাই তো মেয়েদের আদিম বাসনা। ঝড়ের দাপটে তাদের ওলোট-পালোট করে দিতে না পারলে তাদের তৃপ্তি নেই।

পৌরুষ তাদের প্রত্যাশা।

সেই পৌরুষকে প্রদৃপ্ত করে প্রদেয় করে তোলে। তারপর সে নিজেকে প্রদান করে।

উত্তেজনাই ভোগের আনন্দ। ক্ষুধা যেমন খাওয়ার আনন্দ।

ধারা তার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিতে চায়। এতবড় সৌভাগ্যকে প্রত্যাখ্যান করবার তার ক্ষমতা কোথা? ঘর বাঁধবার স্বপ্ন তার রক্তে। কল্যাণকে অবলম্বন করে অতীতে কত স্বপ্নই না সে দেখেছিল। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। তার সন্তানকে গর্ভে ধরেও তাকে সে বেঁধে রাখতে পারেনি।

পারেনি বলেই কি এই আনন্দ-উৎসবের পৃথিবীতে যোগিনী সেজে পথে পথে তার বিরহ গান গেয়ে বেড়াবে?

এই কি জীবনের সংজ্ঞা কি?

কোলাহল, কলরব মুখরিত জীবনের উৎসব প্রাঙ্গন থেকে নিজেকে নির্বাসিত করে ভরা যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ করা!

সে তো জীবন নয়। জীবনের অপঘাত। জীবনকে সে বঞ্চনা করবে না। সে বাঁচতে চায়। জীবনকে সে প্রত্যক্ষ করতে চায়। কামনাময় জীবন। আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবা আনন্দময় জীবন। এমন বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের মধ্যে আর সে বাঁচতে পারছে না। অতীত তার ব্যর্থ হয়েছে। তাব প্রথম যৌবনের প্রথম নিবেদন অপমানে আহত। কল্যাণ শুধু তার জীবনকে ব্যর্থ করেই দেয়নি, তার নারীত্বের লজ্জা ও সম্ভ্রমকে সে অকথিত অপমানে বিপর্যস্ত করেছে। কী ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যেই তাকে দিন কাটাতে হয়েছে! ভাবতেও তার শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে। কী নির্দয়, হৃদয়হীন পুরুষ। আসলে তার মাঝে প্রেমের প্রেরণা ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল না ধারার প্রেমে। শ্রদ্ধা ছিল না তার দেহের আতিথ্যে। ধারাই তাকে আটকে রেখেছিল। যা পেয়েছিল তা নিজের শক্তির জোরে নয়। নিজের কাঙালপনায়। নিজের মিনতির কাতরতায়। কল্যাণ তাকে উপহার দেয়নি। দিয়েছিল ভিক্ষা। সেই ভিক্ষার খুদকুঁড়ো তার নির্মাল্য। সে শ্রদ্ধার দান নয়। গৌরবের পরিচয় নয়। নয় বলেই সে ঝুলি ঝেড়ে পথের পাশে ফেলে

দিয়ে এল। কল্যাণের কোন স্মৃতিই সে রাখল না। ধুয়ে মুছে হাত পরিষ্কার করে ফেলল।

আবার সে নতুন করে আরম্ভ করবে। নতুন পাতায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। তার রূপ আছে। যৌবন তার ফুরিয়ে যায় নি। জীবনের আগুন নিভে যায় নি। অতীতের গৌরব আর ব্যর্থতার অপমানকে আঁকড়ে ধরে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবে কেন?

আবার সে বাঁচবার চেষ্টা করবে।

দেহের আতিথ্য নিয়েই নারী চিরকাল পুরুষের শরণাপন্ন হয়েছে। দেহের বিনিময়েই নারী বেঁচেছে। লজ্জাটা কোনখানে?

ধারাও আর একবার চেষ্টা করবে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে নতুন জীবনে পদার্পণ করবে। এক দরজা বন্ধ করে আরেক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবে। দু-দুয়োরী নতুন ঘর। মনের মত করে ঘরকে সাজাবে। নিজেকেও মেজে ঘষে ঝকঝকে তকতকে করে তুলবে। নতুন ঘরে মানানো চাই তো।

সম্মানিত পদবী। গৌরবময় পরিচিতি নিঃসন্দেহ। আবগারী সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ মুৎসুদ্দির পত্নী। শুধু সৌভাগ্য নয় বরাভয়।

লীলা মুৎসুদ্দির মা। নিমুর মা হওয়ার চাইতে অবধারিত গৌরবময়। উৎপীড়িত মাতৃত্বের সান্ত্বনা। নিমুকে সে ভুলতে পারবে লীলাকে বুকে ধরে। তার স্বামীর সন্তান। যে স্বামী তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যগ্র। প্রেম দিয়ে। ঐশ্বর্য দিয়ে। আরাম আনন্দ দিয়ে।

অতীতকে সে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেবে। মন থেকে মুছে ফেলবে কল্যাণ আর নিমুকে। কল্যাণের সঙ্গে বিবাহ ধারার চোখে একটা প্রহসন। তার মতে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কল্যাণ ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অবান্তর। আর নিমু? শুক্তির ছেলে নিমু। তার জন্মবৃত্তান্ত দুর্ভেদ্য অন্ধকারে অবলুপ্ত। সে বনেদী মুখুজ্যে বাড়ির ছেলে। তার সম্বন্ধেও সে নিশ্চিন্ত।

কুলশীল জাত গোষ্ঠির কথাও সে বিচার করবে না। শুধু একটা খট্‌কা তার মনকে আলোড়িত করে তুলেছে। তার সমাধান কেমন করে করবে ভেবে পাচ্ছে না। মুৎসুদ্দি খৃষ্টান। ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত। তার ধর্মমত ধারার সামনে কাঁটা তারের বেড়া তুলে দিয়েছে। ধারার প্রমত্ত যৌবন কিন্তু কোন কিছুই মানতে চায় না। কোন কিছু বিচার করতে চায় না। সে কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

মুৎসুদ্দিকে এখনো সে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখনো সে সংশয়ের দোলায় তুলছে। বেচারী নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। মাঝে মাঝে সে এমনি সকরুণ দৃষ্টি তুলে ধারার মুখপানে তাকায় মনে হয় যেন সে হাত জোড় করে তার কৃপা প্রার্থনা করছে। ধারার মনে করুণার আমেজ জাগে। তার অধৈর্য দেহ আঁট হয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সাধ হয়। তবু সে চোখ মটকে নিজেকে শাসন করে। খলিফা মেয়ে সে। অতীতের অভিজ্ঞতা তাকে সতর্ক করে দিয়েছে। বঁড়শীতে গেঁথেছে যখন তখন সে ওকে ডাঙায় তুলবেই। তবু একটু খেলিয়ে তোলার আনন্দ।

সে আড়াল থেকে চুরি করে মুৎসুদ্দির শূন্য মুখের পানে চায়। আর মনে মনে হাসে। উল্লাসের হাসি। জয়ের উল্লাস। এত বড় জয়ের গর্বে সে উল্লসিত হবে বই কি!

ছুঁদে অফিসার মুৎসুদ্দি। অধীনস্থ কর্মচারীরা তার দাপটে থরহরি। সেই মুৎসুদ্দি ধারার কাছে একেবারে কাঁচুমাচু। যেন গো-বেচারী ছেলেমানুষটি। হাসির তোড়ে ধারার গা সিরসির করে। তার ভারি মজা লাগে।

ছিল পরিচারিকা হতে চলেছে পরিচালিকা। তার পরিচালনায় সংসারের কাঁটা ঘুরবে। তার অঙ্গুলি সঙ্কেতে মুৎসুদ্দির জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে। দুর্ধর্ষ শ্রান্ত পুরুষ তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে তারি মাঝে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। গভীর আরামে। ওর দাম্পত্য জীবন সুখের

হয়নি। রুগ্না স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই ওর দিন কেটেছে। নিজে সুখি হতে পারে নি।

ধরা তাকে সুখি করবে। তাকে তার বুকভরা প্রেমে নিমজ্জিত করে রাখবে। মাথা তুলতে দেবে না। তার জীবনকে সার্থকতায় ভরিয়ে তুলবে। নিজে সুখি হবে।

আর কিবা সে চাইতে পারে? মেয়েদের আর কিবা কাম্য? একটি পরিপূর্ণ স্বচ্ছল সংসার। নিটোল নিবিড় শান্তি। রূপবান স্বাস্থ্যবান তেজস্বী পুরুষ। শিক্ষিত। সম্ভ্রান্ত। পদস্থ সরকারী কর্মচারী। নিরুদ্বেগ নির্বিঘ্ন ভবিষ্যৎ। পেন্সন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। ইন্‌সিওরেন্স। ধারার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কংক্রিট করা পাকা ভিতের উপর গাঁথা।

হলোই বা খৃষ্টান। হলোই বা তাদের ধর্মমত বিভিন্ন। তাই বলে কি ধারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে নাকি? সুধার পাত্র দূরে ঠেলে দেবে নাকি? পাগল হয়নি তো ধারা।

পুরোনো পরিচয়কে সে প্রশ্রয় দেবে না। নতুন জ্যোৎস্নায় গা ধুয়ে সে নতুম হয়ে উঠবে। নতুন রূপ, নতুন প্রাণ, নতুন দেহের নতুনতর আতিথ্য নিয়ে সে প্রণয়ব্যাকুল প্রেমিকের কণ্ঠলগ্ন হবে।

এমনি একটা সুখস্বপ্নে বিভোর হয়েই ধারা সেদিন শুক্তির বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে ছিল। কী বলতে চেয়েছিল শুক্তিকে সেই জানে। নিমুকে হয়তো একবার দেখবার বাসনা ছিল।

সে রাত্রে বাড়ি ফিরল ধারা, অপমানে আধমরা হয়ে। শুধু অপমান নয় ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। কল্যাণের আকস্মিক আবির্ভাব তার ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনাকে নাস্যাৎ করে দিল। তার অন্তরের উৎসব আয়োজনকে দুস্তর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল। তার স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে দিল।

কল্যাণ শত্রুতা করলে তার দাঁড়াবার মাটি কোথা ? তার স্বামীত্বের দাবিকে সে ঠেকাবে কেমন করে ?

ভরাডুবির মত সর্বস্বান্ত মুখে সে বাড়ি ফিরল। তার মুখের চেহারা দেখে মুৎসুদ্দি ব্যথিত হলো।

ব্যাপার কি ?

কম্পিত আবেগে মুৎসুদ্দি তার হাত দুখানি চেপে ধরল। ছিন্নমূল লতার মত ধারা লুটিয়ে পড়ল তার বুকের উপর। অঝোরে ফুলে ফুলে কাঁদল তার বুকে মুখ লুকিয়ে। গভীর তৃপ্তিতে পরম আদরে সে ধারার মাথাটি চেপে ধরল বুকের উপর নিবিড় করে। মুৎসুদ্দিব বুঝতে বাকি রইল না বক্ষলগ্না তরুণীর নীরব অশ্রুধারার মধ্যে দিয়ে কোন রহস্য উদ্ঘাটিত হলো।

এ তার বাঙ্ময় প্রস্তাবের অকথিত উত্তর।

লুব্ধ মনে জোর পেল মুৎসুদ্দি। বুকে সাহস পেল। সে দুহাতে তার মুখখানি তুলে ধরে তার অশ্রুপ্লাবিত মুখে প্রথম চুম্বন এঁকে দিল।

আঁচলে চোখ মুছে লজ্জারক্ত মুখে তার পানে তাকাল ধারা। মুৎসুদ্দি গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে গুঞ্জন তুলল, আমি তোমায় ভালবাসি ধারা। আমি তোমায় চাই।

ধারা অকম্পিত প্রত্যয়ের দৃঢ়স্বরে বললে, আমি জানি। জানি। তোমার এই ভালোবাসার কাছে আমার ধর্মকে পর্যন্ত হার মানতে হলো। আমার চোখে আমার ধর্মের চেয়ে তোমার প্রেম বড় হলো।

হঠাৎ সে মুৎসুদ্দির হাত দুখানি চেপে ধরে আবেগ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো, না। না। তোমাকে আমি হারাতে পারবো না। আমার চোখে প্রেমই সব চেয়ে বড় ধর্ম। সব ধর্মই প্রেমধর্ম। আমি কালই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করবো। আমি মন ঠিক করেছি। তুমি বেবস্থা করে দাও।

মুৎসুদ্দি দ্বিধাজড়িত স্বরে বললে, আমি কিন্তু তোমাকে ধর্মমত বদলাতে—

মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে ধারা তাকে বাধা দিয়ে বললে, না। না। তুমি কেন বলবে? আমার বিবেক বলেছে। আমাদের প্রেমের মাঝে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব কোন আড়াল থাকবে না। কোন ছায়া থাকবে না। স্বামীস্ত্রীর ধর্মমত এক না হলে মিলন সার্থক হয় না। স্ত্রীর অন্য নাম সহধর্মিনী।

মুৎসুদ্দি সম্মোহিতের মত তাকে বুকে টেনে নিল।

ধারা বললে, আর আমি কিছু চাই না। তোমার চোখে আমার প্রেম সত্য হোক।

ধারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিল। কল্যাণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই হয়তো সে ধর্মান্তর গ্রহণ করল। তারপর খৃষ্টান বিবাহ আইন মতে তার বিবাহ হলো মুৎসুদ্দির সঙ্গে।...

ধারার অতীত লুপ্ত হয়ে গেল। পরিচয় মুছে গেল। ধারার নতুন করে জন্ম হলো।

সে ধারা আর শুক্তির কাছে আসবে কেমন করে?

রমা হন্তদন্ত হয়ে কল্যাণের ঘরে ঢুকেই দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল।

কল্যাণ শুয়েছিল। উঠে বসল। অবাক হয়ে রমার মুখপানে চেয়ে বলে উঠল, ও আবার কি! দরজা বন্ধ করলে কেন?

রমা মেঝের উপর চেপে বসে চোখ ঘুরিয়ে বললে, কারণ আছে নিশ্চয়ই। গোপন কথা শোনাবো বলে।

রমা হাঁপাচ্ছে। একচোখে কাঁদছে সে। আরেক চোখে হাসছে। একগালে আনন্দের আবেশ। আরেক গালে ঘৃণার আভাস। যেন বহুরূপী।

কল্যাণ তার মুখের ভঙ্গি দেখে চমকে গেল। হাসিও পেল।

—কি হয়েছে কী? কী এমন গোপন কথা? বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল কল্যাণ।

হঠাৎ রমা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, রোসো। একটু সবুর দাও। আমি আসছি।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রমার ছটফটানি দেখে শঙ্কিত হলো কল্যাণ।

শুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে রমা ঘরে ঢুকল। আবার তেমনি দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতে বললে, মাষ্টারের মুখে চুনকালি দিয়েছে বউদি। চুনকালি দিয়েছে।

আঁট হয়ে মেঝের উপর বসলো রমা।

—মরণ দশা! হেঁয়ালি রেখে খুলে বলবি তো বল।

শুক্তি ধমক দিল।

রমা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বলবো বলেই তো তোমাকে ডাকলুম গো। বলতে না পারলে যে আমি দম ফেটে মরে যাবো। মাষ্টারের কপালে এতো হেনস্থাও ছিল।

কাঁদ কাঁদ মুখে সে কল্যাণের পানে তাকাল।

শুক্তি ও কল্যাণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বসলো।

রমা রসান দিয়ে রঙচঙ মাখিয়ে বিবৃত করলো ধারার কলঙ্কিত সৌভাগ্যের কাহিনী।

পড়বি তো পড়। রমার চোখেই প্রথম পড়ল।

রমা কলকাতা গিয়েছিল তার পিসীর বাড়ি। পিসতুতো ভায়ের বিয়েতে। পিসতুতো ভাইটি আবগারী আপিসে চাকরি করে। খাস বড় সাহেবের অধীনে। বিয়ের বউভাতে নেমন্তন্ন এলো বড় সাহেব আর তার বউ। বড় সাহেবের বউকে দেখে চমকে গেল রমা। নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেনা সে। বিশ্বাস করবে কেমন করে? মিষ্টির দোকান যে রাতারাতি মদের দোকান হয়ে

গেছে। আঁচলে চোখ ঘষে চোখ বড় করে অনেক দেখে দেখে সে নির্ভুল হলো।

ধারা বই কি! ঐশ্বর্য দিয়ে দেহ ঢাকলেও গলার স্বর ঢাকবে কি দিয়ে? কনেকে কাছে বসিয়ে গল্প করল। জমকালো উপহার দিল তার হাতে। রমা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ইচ্ছে থাকলেও রমা নিজেকে চেনা দিতে পারেনি। দেবে কেমন করে? আজ সে কত উঁচুতে! চাপরাশী। আরদালি। মোটর গাড়ি। কী পোষকেব বাহার! কী গয়নার জোলুষ। রূপ যেন জ্বলে উঠেছে।…রমা সারাবাত নাকি ঘুমুতে পাবেনি। পবের দিন সকালে বাকিটুকু তার পিসতুতো ভায়ের কাছে গোপনে কর্ণগোচর করল। ছিল দাসী। হলো দাবী। ছিল হিন্দু হলো খৃষ্টান। মৃতদার মুৎসুদ্ধি সাহেবের নয়নের মণি।

রমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিবৃত করল যা কিছু নয়নগোচর এবং কর্ণগোচর করে এসেছে। যে ধারাকে সে পূর্বে দেখেছে বা যে ধারাকে সে চিনতো এবং যে ধারাকে সে দেখে এলো তাবা এক মানুষ নয়। ইতি-মধ্যে তার জন্মান্তর ঘটেছে।…

রমার বলা শেষ হলে তিনজনেই রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতায় খানিকক্ষণ বসে রইল।

কল্যাণ হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে হাসতে হাসতে বললে, একেই বলে পাতা-চাপা কপাল।

রমা আর শুক্তি একসঙ্গে তার মুখের পানে চাইল।

রমা বললে, পোড়া কপাল। এর পরও মুখে হাসি ফুটছে?

শুক্তি বললে, ওরা হাসবে না কেন? লজ্জা তো ওদের নয়। লজ্জা আমাদের। মেয়েজাতের। দেহের বিনিময়ে মেয়েদের বেঁচে থাকবার এই হীন প্রয়াস। যেমন কদর্য। তেমনি কুৎসিৎ!

শুক্তির মুখে অপরিসীম বেদনাব ছায়া। তার কণ্ঠে অপমানিতের ক্ষোভ ও ঘৃণা!

ব্যথিত হলো কল্যাণ। সে অপ্রতিভের ভঙ্গিতে দ্বিধাজড়িত স্বরে

বললে, আপনি ও কথা ভাবছেন কেন ? কে বলতে পারে যে এর মাঝে সত্য নেই ?

উত্তর দিল রমা। জোর গলায়। বলল, না, নেই। থাকতে পারে না। ওর মাঝে সত্য নেই। সততা নেই। সৌভাগ্যের মুখ দেখবার লোভে নিজের ধর্ম্মকে যে মিথ্যে করে দিল, তার মাঝে তুমি সত্য খুঁজছো ?

মুখ ঝামটা দিয়ে আলগা খোঁপাটা জড়াতে জড়াতে অস্থির পায়ে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

শুক্তির মূর্তি পালটে গেছে। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কল্যাণের বুঝতে বাকি রইল না, তার চিন্তার ধারাটা বইছে এক নতুন খাতে। কেমন যেন এলোমেলো দেখাল তাকে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে যেন সে বানচাল হয়ে গেছে।

কল্যাণের কথা বলবার সাহস হলো না।

শুক্তিব মন উজান বেয়ে চলে গেছে দূব দূরান্তরে। অতীতের মাঝ দরিয়ায়। মেটারনিটির কেবিনে।...

নার্শ পরিচয় করিয়ে দিল সত্তপ্রসূতা ধারার সঙ্গে। তার পাশের ঘুমন্ত শিশুর মা। ক্ষীণকণ্ঠে ধারা বললে, তুমি ওকে বাঁচাতে পারবে। আমি পারবো না। তুমি ওকে নাও।...ওর পিতা নিরুদ্দেশ।"

প্রথম পরিচয়ে ব্যথিত হয়েছিল শুক্তি তার রিক্ততার বেদনায়। তাকে ভাল লেগেছিল। তাকে ভালোবেসেছিল।...নিজের মনের মাঝে ধারার জন্য একটি বিশেষ আলো জ্বেলে রেখেছিল শুক্তি। সে আলো আজ তাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে হচ্ছে।

কল্যাণ তার চোখের সামনে স্থির হয়ে বসে আছে। সেই নিঃশব্দতার অন্তরালে তার জন্য কি ওর মনের অতলে কোন ক্ষোভ কোন খেদ অবশিষ্ট নেই ?

ধারা আর কল্যাণ। নিমুর জনকজননী। এরাই নিমুকে সংসারে এনেছিল। দোঁহে এক হয়ে এক সুরে সুর মিলিয়ে এরা নিমুকে সৃষ্টি

করেনি। নিমু আকস্মিকের গাঁথা মালা। নিমুর সৃষ্টির জন্যই যেন ঝড়ের দাপটে তুজনে কটা দিনের জন্য কাছাকাছি হয়েছিল। আবার তুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গেল। ছাড়াছাড়ি হলো চিরদিনের মতো। শুক্তির কেমন বিসদৃশ মনে হয়। অস্বাভাবিক ঠেকে। নদি সাগরে মিলে আবার ফিরে যায় কেমন করে ?

দৈবাৎ তার চোখে পড়ল উৎপীড়িত কল্যাণের ব্যথিত কুণ্ঠিত মূর্তি। সে সোজা চোখ তুলে তাকাল তারপানে। সন্ধ্যার পৃথিবী যেন অস্তরাগ-রঞ্জিত বিষণ্ণ আকাশের দিকে নিজেকে মুহূর্ত তুলে ধরল। তার বিশুষ্ক গালের উপর ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

॥ আট ॥

শুক্তি গলায় জোর দিয়ে বললে, তুমি যাই বলো না কেন আমার বিশ্বাস, যে-আঘাতে নতুন ধারা গড়ে উঠল, তাব জন্যে দায়ি শুধু তুমি একা।

হাসলো কল্যাণ। মুখ নিচু করে বললে, আঘাত ভাঙ্গে, শুক্তি দেবী। আঘাত গড়ে না। আমার আঘাতে ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে গড়ল তার ভাগ্যবিধাতা। তার অমোঘ নিয়তি। আঘাতটা গৌন। মুখ্য তার নিজেকে নতুন করে গড়বার দুর্নিবাব আকাঙ্ক্ষা। তার অতৃপ্ত মনের বিলাস বাসনা।

—সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মানুষ তো দেবতা নয়। সে দুহাত বাড়িয়ে তোমাকে হৃদয়ে গ্রহণ কবতে চাইল আব তুমি তার হাত মুচড়ে ঠেলে দিলে। যে একদিন একান্ত হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল তোমার কাছে, ইচ্ছে থাকলে তুমি তাকে অনায়াসে আপন করে নিতে পারতে। নিজের মত করে গড়ে নিতে পারতে।

সশব্দে হেসে উঠল কল্যাণ। কৌতুক করে বললে, বাস্‌রে! তা, হলে তো তার সৌভাগ্যের পথরোধ করে দাঁড়ানো হতো। ওর সৌভাগ্যের জোয়ারে যে ওব গলার পাথর হয়ে ওকে আমি ভরাডুবি করিনি, তারজন্য আমি মনেপ্রাণে আমার ঈশ্বরকে প্রণতি জানাই। আমি ওর শুভাকাঙ্ক্ষী। ওকে ভালো না বাসলেও ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রমার মতই ওর সেবায় একদিন আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছিলুম। শুধু সেই কৃতজ্ঞতার দাম দিয়েছিলুম নিজেকে ওর কাছে বিক্রী করে। ওকে বিবাহ করেছিলুম ওর সন্তানকে পিতৃত্বের পরিচয় দিয়ে সম্মানিত করবার জন্যে।

—ওর সন্তানকে?

বাঁকা চোখে ঝাঁঝালো গলায় ঝলসে উঠলো শুক্তি।

দমে গেল কল্যাণ তার গলার ঝাঁজে। সে চোখ তুলে তাকাতে পারল না তার মুখের পানে। দেখতে পেল না শুক্তির শুভ্র সুন্দর মুখখানি কি রকম আগুনের মত টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

কল্যাণকে নিরুত্তর দেখে শুক্তি বললে, আঘাতের দায়িত্ব না হয়, নাই নিলে, সন্তানের দায়িত্বও নিতে চাও না নাকি?

নিজেকে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে কল্যাণ উত্তর দিল, না নিয়ে উপায় কি? সন্তানের আবির্ভাবটা অবধারিত দেবতার বরে নয়। আমার পূর্বজন্মের কর্মফলে। কর্মফল মানতে হবে বই কি!

—কি করে বুঝলে দেবতার বরে নয়? সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার আশীর্বাদ আছেই।

—আশীর্বাদ কি অভিশাপ জানি না। তবে এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাটা একান্ত শোকাবহ। আর ঐটেই আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি।

—না, বড়ো বাঁধন?

একবার মুখ তুলে তাকাল কল্যাণ শুক্তির পানে। তারপর মাথার ঢেউতোলা চুলগুলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে পেছনে ঠেলে দিতে দিতে বললে, বাঁধনটা যে গতিহীন। নীরস। প্রাণের স্পর্শ না থাকলে বাঁধনকে বড়ো বলবো কেমন করে?

শুক্তি বললে, বড়ো হোক, ছোট হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ফাঁশ যখন পড়েছিলে তখন তার দায় দায়িত্ব যে তোমার সে কথা তোমাকে বোঝাতে হবে না। আলোয় হোক আর অন্ধকারেই হোক অসাবধানে পা যখন খানায় পড়েছে, পা মচকাবেই। পায়ে ওষুধ না দিয়ে খানা বোঁজাবার চেষ্টা করার মত এও একটা নিছক ধৃষ্টতা। এর কোন যুক্তি নেই মাষ্টার! তাই আমার মনে হচ্ছে আজকের ধারাকে সৃষ্টি করেছে তোমার নিষ্ঠুর অবহেলা। তোমার নির্মম প্রত্যাখ্যান।

যে-টুকু ভালোবাসা তার মাঝে তোমার জন্যে অবশিষ্ট ছিল, তাও শুকিয়ে মরে গেল, খাদ্যের অভাবে।

শুক্তিকে উত্তেজিত মনে হলো। সে যেন কল্যাণের সঙ্গে বিরুদ্ধতা করবার জন্যই নিজেকে কঠিন করে তুলেছে। সে কল্যাণকে আঘাত করতেই চায়। কিন্তু তার কথার প্রতিবাদ করতে পারে না তো কল্যাণ। কথাগুলো যত রূঢ়ই হোক তার মাঝে সুর আছে। যুক্তি আছে।

শুক্তির নতুন মূর্তি দেখে কল্যাণ শঙ্কিত হলো না। মুগ্ধ হলো। ব্যথিত হলো। এতোদিন শুক্তির মাঝের প্রসন্ন মাতৃভাবই সে প্রত্যক্ষ করেছে। আজ তার চোখে পড়ল বাজ-পড়া আগুনে-জ্বলা নারী অন্তর। গন্ধপুষ্পের একগাছি শুকনো মালা। হাওয়া লেগে ধুলোর পর্দা সবে যেতেই পুরানো গন্ধ ভেসে উঠেছে। তার কাছে ভবিষ্যতের কোন কৌতূহল নেই। বর্তমানেব ঔৎসুক্য নেই। তার হাট ভেঙ্গে গেছে। শেষ হয়ে গেছে বেচাকেনা। সৌন্দর্যের জ্যোতির্ময়ী আত্মার মাঝে জেগে আছে শুধু তাব বিগত দিনের অমিয় সৌরভটুকু।

নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুষে নিল কল্যাণ সেই সৌরভ। দেহ তার বাঁশী হয়ে উঠল। সে চিরন্তনীকে নতুন চোখে দেখল। নতুন করে আবিষ্কার কবল। অভিনব ও অসামান্য মনে হলো শুক্তিকে।

একসময় শুক্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আজ যদি দুজনার মাঝে ছেলেটাও থাকতো।

কল্যাণ জবাব দিল, বন্যার মুখে সেও ভেসে যেতো শুক্তি দেবী। এব গতিরোধ করতে কেউ পারতো না।

মাথা তুলে মুখ বেঁকিয়ে শুক্তি বললে, তোমার পাথুরে প্রেম ছাড়া।

হেসে ফেলল কল্যাণ। অস্ফুট স্বরে বললে, পাথরে মাথা ঢুকেই বোধ হয় কপাল খুলল।

—কপাল খুললো, কি কপাল ফুললো কে জানে।

—কপাল খুললো। আঙুল ফুলে কলাগাছ হলো।

হাসলো কল্যাণ। চোখ রাঙালো শুক্তিঃ একটা মেয়ের দুর্ভাগ্যকে নিয়ে কৌতুক করতে পারছো?

—দুর্ভাগ্য? কী বলছেন আপনি? তার ভাগ্যকে আমার ঈর্ষা হয়। ভাগ্যবতী সে। আমার সব চেয়ে আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে আমি তার সৌভাগ্যের দোর খুলে দিলুম। আমি তার সৌভাগ্যের বাহন

—তুমি আস্ত বুনো। তুমি বেমক্কা। বেপরোয়া।

ঢেউয়ের তোড়ে কথাগুলো শুক্তির মুখ দিয়ে বেফাঁস বেরিয়ে গেল। সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

ভর্ৎসনা গুলোর মাঝে মধুর অন্তরঙ্গতার সুর। কল্যাণের বুকে কাঁপন ধরায়।

তাদের ভাবের ঘোরে ঘা মারল রমা ঘরে ঢুকে। তাকে দেখেই কল্যাণ হাসতে হাসতে বললে, আজ ঘটা করে রান্না করো রমা। আমি আজ তোমাদের খাওয়াবো।

—কেনে গো?

কল্যাণের উল্লাস তাকে উচ্চকিত করে তুলল। সে বড় বড় চোখদুটোকে আরো বড় করে তাদের পানে তাকাল।

কল্যাণ আবেগ উচ্ছসিত কণ্ঠে বললে, বন্ধনের চেয়ে মুক্তির আনন্দেব স্বাদ বেশী। মুক্তি আলো। বন্ধন অন্ধকার। মুক্তি অন্তরাত্মার গভীর উপলদ্ধি। বন্ধন মায়া। চেতনার দুঃসহ কাঁটা। মুক্তি দেবতাব বর। বন্ধন নিজের সৃষ্টি। মুক্তি স্পষ্ট। বন্ধন ঝাপসা। তুমি আমার মুক্তির বাণী বহন করে এনেছো বমা। আমরা উৎসব করে আনন্দ করবো।

শুক্তি চুপ করে রইলো। কোন কথা বললে না। আচমকা একটা চঞ্চল হাওয়া ঢুকে তার মনটাকে এলোমেলো করে দিল। তার গোছালো অতীতের সব কিছুকে যেন সরিয়ে নড়িয়ে দিয়ে নিকটতম একটা নিবিড় বর্তমানকে সেইখানে বসিয়ে দিয়ে গেল।

শুক্তি যেন এতদিন পরে কল্যাণের মাঝের আসল মানুষটার পরিচয় পেল।

তাদের দুজনকেই রমার কেমন দুর্বোধ্য মনে হলো।

শুক্তি এতদিন তার অতীতেব মধ্যেই বাস করছিল। অতীত তার জীবন থেকে নির্বাসিত নয়। নির্বাপিত নয়। অস্পষ্ট বা ঝাপসা নয়। স্বল্পায়ু হলে ও তাব স্মরণীয় নিমেষগুলি তাব স্মৃতিপথে উজ্জ্বল। ক্ষণভোগ্য হলেও তার দাম্পত্যজীবন ছিল অসাধারণ ও অসামান্য। একটি বিশেষ রূপ নিয়ে এক বিশেষ জগতে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। অনেকটা পৌবাণিক আদর্শেব। সেই আদর্শকে আঁকড়ে ধরেই অতীতের স্মৃতি মন্দিবেব প্রচ্ছন্ন বেদিতে পূজারিণীর মত ধ্যানাবিষ্ট হয়ে থাকতো। তাব নিভৃত-নিবিড় পূজা মন্দিবে ভিড় ছিল না। তার জীবন-যাত্রাব মধ্যে এমন কোন ফাঁক ছিল না যেখান দিযে কোন স্থূল ব্যাঘাত প্রবেশ কবে তার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

নিমু বড় হতে লাগল। জ্ঞানেব আলো তাকে স্পর্শ করতে লাগল। সে শামুকের মত খোলেব ভিতব থেকে বেরিয়ে এলো। মাকেও সে হাত ধবে টেনে আনতে লাগল, অতীতের প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে বর্তমানের অবাবিত আকাশ নিচে। নিজেব ঔৎসুক্য না থাকলেও, ছেলে সংসাবকে জানতে চায়। চিনতে চায়। তাকে অন্ধকারে রাখা চলে না। কাজেই শুক্তিকে আবার ভিড়ে নামতে হলো। ঘোমটা তুলতে হল। বাইরে ঘোমটা না থাকলেও ভিতবে তার ঘোমটা ছিল। মনে ছিল মোটা আবরু। মনের আলো ছিল অদৃশ্য। এই আলো একদিন তার জীবনে দেখা দিয়েছিল, নানা রঙে।

পেছনের অন্ধকার পটে উজ্জ্বল আলোক চিত্রের মত মাতৃভাবে মাতৃমূর্তিতে সে জীবনের নতুন ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল।

দূর থেকে শুক্তির সেই রূপই দেখেছিল কল্যাণ। দেখেছিল শ্রদ্ধামগ্ন চিত্তে জীবপালিনী জগদ্ধাত্রীর মত সেই ছবি। সে ছবির তুলনা হয় না। সব থেকে স্বতন্ত্র। ধ্যানের মূর্তি। স্তবের কবিতা। প্রথম দর্শনেই কল্যাণের মনে ছাপ রেখে গেল। ভক্তির ছাপ। শ্রদ্ধার ছাপ।

সে দূরেই ছিল। নিমুই তাকে কাছে নিয়ে এলো। কাছে এলেও একটা সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরাল ছিল। সে অন্তরালটুকু সরে গেল কল্যাণের পরিচয়ের ধাক্কায়। আকস্মিকের বিস্ময়ে অন্তরালবর্তিনী অবরোধ ভেঙ্গে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। নিমুর নিরুদ্দিষ্ট পিতা তার হাত ধরে নিমুর মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। এ অসম্ভবের জন্য তো শুক্তি প্রস্তুত ছিল না। তাই অপ্রত্যাশিতের আগমনে তার গোপন মনের একটা অন্ধকার কোণ--যেখানে সে নিমুর পরিচয়কে সন্তর্পনে চাপা দিয়ে রেখেছিল—আশঙ্কায় ও সংশয়ে শিলীভূত হয়ে গেল। আর সেই শিলার উপর নিমুর পিতৃপরিচয় খোদিত হয়ে রইল উজ্জ্বল অক্ষরে। ইষ্টমন্ত্রের মত গোপন সেই পরিচয়লিপির পানে চেয়ে চেয়ে ওর চোখে একটা নতুন আলোর ছটা লাগে। যে আলো আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার কোণে এতদিন লুকিয়েছিল।

নিমু কল্যাণের প্রতিবিম্ব। আর কারুর চোখে না পড়ুক, শুক্তির চোখে পড়ে বইকি! নিমু বড় হয়ে যেমনটি হবে কল্যাণ যেন তারি দর্পণ। শুক্তি চেয়ে চেয়ে দেখে আর গভীর মনোযোগ দিয়ে দুজনের প্রতিটি খুঁটিনাটি তুলনা করে। একই ছাঁচের মুখ। চোখের, ঠোঁটের, নাকের একই গড়ন। হাসিটুকু পর্যন্ত একই ভঙ্গির।

কল্যাণ সুদর্শন। তার সৌকুমার্য মনকে টানে। তাকে একান্ত গোবেচারা ও মুখচোরা মনে হতো শুক্তির। কিন্তু ধারা সম্বন্ধে তার মনের উদ্ধত পরিচয় পেয়ে তার ধারনা বদলে গেল। কল্যাণের দৃপ্ত পৌরুষ তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তাকে দেখে মনে হলো ওর বিবেচনা-শক্তি গভীর। ওর বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ। ও ক্ষমাহীন। ও অশান্ত। ও

দুর্বার। ও অনেক দেখেছে। অনেক শিখেছে। অনেক হারিয়েছে। পায়নি কিছুই। তাই ওর মনে শান্তি নেই। আত্মার তৃপ্তি নেই।

অপরিচিত এবং অসম্পর্ক পুরুষের জন্য এই ধরনের ভাবনা তার স্বভাববিরুদ্ধ ও ধর্মবিরোধী। কিন্তু ভাবনাটা তার নিজের নয়। ভাবনাটা নিমু তার হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। নিমু সম্বন্ধে সে নিরুদ্বেগ হতে চায়। নিমুর ভালমন্দই তার জীবনচিন্তা। ওরা না জানুক, কল্যাণ তো আর অপরিচিত নয়। নিঃসম্পর্ক নয়। সে নিমুর পরমাত্মীয়। সেই সম্পর্কটাই তার মনের মাঝে মাকড়সার জাল বুনতে থাকে। নিমুর আর কল্যাণের সম্পর্কের জালে সে ও জড়িয়ে পড়ে। নিমুকে বাদ দিয়ে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। নিমু তার জীবনের একটা অচ্ছেদ্য অংশ। আবার কল্যাণকে বাদ দিয়ে নিমুকে কল্পনা করা চলে না। তারা তিনজনে মিলে একটি সুসম্পূর্ণ সুখি পরিবার। ভাবতে তার গা সিরসির করে। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তাদের দুজনার মাঝখানে কল্যাণ কেমন করে এসে পড়ল! নিমুকে ভাবতে গেলেই কল্যাণ যে পাশে এসে দাঁড়ায়। কল্যাণ যেন নিমুকে গ্রাস করে আছে। নিমুকে আলাদা করে দেখবার আলাদা করে ভাববার আর উপায় নেই। নিজেরো মনের আকাশে ভোরের ঘন কুয়াশার মত কল্যাণের ছায়া। নিজেকে তার স্পষ্ট চোখে পড়ে না। নিজের কাছে নিজে যেন শুক্তি অস্পষ্ট আর ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার মনের স্বচ্ছ আলো যেন ঘোলাটে আর নিষ্প্রভ হয়ে আসছে।

ভয় পায় শুক্তি নিজের এই নতুন পরিচয় পেয়ে। তার বুক দুর দুর করে। মনে হয় যেন একটা অদৃশ্য জালে সে জড়িয়ে পড়ছে। বাঁধা পথের বাইরে একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে জোর করে টানছে। তার পা কাঁপে। তার বুক কাঁপে। তার শ্বেতশুভ্র কপোল বেয়ে দরদর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে রাত্রে ঘুমোতে পারে না। জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য শক্তি সংহত করে। স্বামীকে ধ্যান করে। ঠাকুরকে ডাকে, বল দাও। মনে যেন দাগ না লাগে।

শুক্তি পুজোয় বসেছিল।

নিজেকে তার ভীষণ হৃতবল মনে হচ্ছিল। নিরাশ আর নিরুৎসাহ। দুঃখে, লজ্জায় আর অনুতাপে ঠাকুরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে দেবার জন্য অশ্রুজলে আত্মশুদ্ধি করে নিচ্ছিল।

নিমু চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকল : মা দেখবে এসো মাষ্টার মশায়, কি সুন্দর তাসের কেল্লা বানিয়েছে। এসো মা।

শুক্তি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে নিমুর পানে চেয়ে বললে, তুই দেখগে। আমি এখন যেতে পারবো না।

—একবারটি চলো মা, একবারটি। দেখবে চলো মা। ওঃ! কী সোন্দর!

—এখন যেতে পারবো না। তুই-যা। বিরক্ত করিস না।

ধমক দিল শুক্তি। একগুঁয়ে ছেলে মায়ের পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, একবারটি দেখে আসবে চলো। মাষ্টার মশায় তোমায় ডাকছে।

শুক্তির সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। সে একটা ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পিঠ থেকে গড়িয়ে নিমু মাটিতে পড়ে গেল। শুক্তি তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুলে তাকে চড় আর কিল মেরে বিপর্যস্ত করে তুললে।

ছেলেটা চিল চেঁচাতে লাগল। চিৎকার শুনে রমা এসে তাকে টেনে বুকে তুলে নিল।

—কী হলো কি? এমন করে মারলে কেন?

—বেশ করেছি। নিয়ে যা ওকে আমার সামনে থেকে।

শুক্তির অগ্নিমূর্তি দেখে রমা নিমুকে বুকে করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শুক্তি ঘরের দরজা বন্ধ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে উছলে উছলে কাঁদতে লাগল।

বেলা বাড়ল।

দুপুর গড়িয়ে গেল। শুক্তি দরজা খুলল না। ঘর থেকে বেরুল না। ছেলে খেতে বসলে কাছে এসে বসা শুক্তির নিয়ম। সে নিয়মের আজ ব্যতিক্রম ঘটলো। রমা অনেকবার তার ঘরের চারিপাশে ঘোরাঘুরি করল। ভেজানো জানলার ফাঁক দিয়ে দেখল নিশ্চেতনের মত কাঠ হয়ে পুজোর আসনে বসে আছে শুক্তি। তার ধ্যান ভাঙাতে কারুব সাহস হলো না।

বিকেলেব দিকে রমা কল্যাণকে খবর দিল, বউদি এখনো ঘর খোলেনি।

সেদিন একাদশী। শুক্তি জলস্পর্শ কবেনি।

কল্যাণ অন্যমনস্ক গাম্ভীর্যে মুখ নিচু কবে কি ভাবল, তারপর রমাকে বললে, আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি।

নিমুকে সঙ্গে নিয়ে মাষ্টার উপরে উঠে গেল। মাষ্টার বারান্দায় দাঁড়াল।

নিমু দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, দবজা খোলো মা। আমাকে মাপ কবো মা। আব কখখনো এমন করবো না। তোমার পায়ে পড়ি রাগ করোনা মা।

দরজা খুলে শুক্তি বেরিয়ে এসে নিমুকে বুকে তুলে নিল। বর্ষণ ক্লান্ত শ্রাবণ আকাশের মত তার মুখখানা থমথম করছে। তার সামনে যেতে কারুব ভরসা হলো না।

রমা কল্যাণকে বললে, বউদির মন ভাল নেই তোমার মেম্‌নি বউ এর কীর্তি শুনে পর্যন্ত। সেদিন থেকে মনটা কেমন উড়ো উড়ো।

কল্যাণ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করল, ধাবাকে খুব ভাল বাসতো, না?

—ওরে বাসরে! কী ভালোই বাসতো। নিজের বোনের মত। তাইতো ধাক্কাটা ওর বুকের হাড়ে গিয়ে বেজেছে।

—কিন্তু নিমুকে হঠাৎ অমন করে মারলেন কেন?

রমা যেন কি বলতে গিয়ে কথাটা জিবের ডগা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে,

ঢোঁক গিলে বললে, পুজোয় বসেছিল, জ্বালাতন করছিল তাই। পুজোয় বসলে ও আলাদা মানুষ। আলাদা জগতে চলে যায়।

কল্যাণ উৎসুক দৃষ্টি তুলে রমার পানে চাইল। চাপা গলায় রমা বললে, ওর স্বামীর জগতে। স্বামীর সঙ্গে ও কথা বলে। হাসে, কাঁদে, প্রেম করে। মান অভিমান করে। আমরা সব আড়াল থেকে দেখেছি শুনেছি। গায়ে কাঁটা দেয়।

—খুব ভালবাসতেন স্বামীকে?

—খুব মানে? সে এ পৃথিবীর প্রেম নয়। সগ্নের। নইলে জেনে শুনে কোন মেয়ে আবার মরণের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধে। কেউ বাধা দিতে পারলে না। কেউ ওর মন টলাতে পারলে না। নিজের ভালো-বাসার জোরে নিজেকে উচ্ছুগগু করে দিয়ে নিমুকে পেটে ধরলে। বংশের ধারা বাজায় রাখলে।

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমা বললে, বিয়ের জীবন তো বড় জোর ছ'টি মাসের। যেন পুতুল খেলা। পুতুলের বিয়ে। স্রেফ রোগা মানুষের বায়না। তার শখ মেটাবার জন্যেই ও নিজেকে বলি দিল। তার কোন শখকেই ও অপূর্ণ রাখেনি। তার সেবায় ও নিজেকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তার চরণে অঞ্জলি দিল। সেই ছ'টি মাসের জীবনে ওরা তুজনে মিলে দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে যে কাব্যি রচনা করেছিল, তারি পাতা উলটিয়ে আজো ও জীবনে মধুর স্বাদ পায়।

রমা রসিয়ে রসিয়ে বিবৃত করে সমর শুক্তির প্রেমের ইতিহাস। কল্যাণ গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে। কল্যাণের অদ্ভুত মনে হয়। অলৌকিক মনে হয়। অভাবিত এই প্রেমের কাহিনী। জীবন্ত মেয়ে মরণের সঙ্গে গাঁট বাঁধল। দেহে যৌবনের বাতি জ্বেলে মৃত্যুর আরতি করল। মৃত্যুর কাছে জীবনের বর চাইল। প্রেমের পূজা করে নির্মাল্যকে আদায় করল।

নির্মাল্য। তার প্রেমের পূজার নির্মাল্য। সেই নির্মাল্য আঁচলে

বেঁধেই আজো সে পথ চলেছে। কল্যাণের বুকের নিচে বাষ্পের জোয়ার ওঠে। ভাবের বাষ্প। ভক্তির বাষ্প। শ্রদ্ধা আর অনুরাগের বাষ্প।

কল্যাণের চোখদুটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। রমা বলে, ও মানুষ নয় গো মাষ্টার। ও দেবী। ওর গায়ের হাওয়া লাগলে মনের ময়লা মাটি ধুয়ে যায়। দেহ পবিত্র হয়।

পরের দিন সকালে শুক্তি কল্যাণকে বললে, আমার ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে মাষ্টার, ওকে অতো আস্কারা দিয়ো না। ওর দিকে নজর রেখো।

প্রথমটা চমকে গেল কল্যাণ তার গলার স্বর শুনে। সে নিঃশব্দে মাথা নিচু করলে। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলে, কেন, ছেলে বিগড়ে যাবে কেন? কী করলে সে?

মৃদু হাসির রেখা ভেসে উঠল কল্যাণের অধরে।

তার হাসি দেখে গা জ্বালা করে উঠল শুক্তির। সে রুক্ষ অভিযোগের স্বরে বলে উঠল, ওর মায়ের চেয়েও তুমি ওর স্নেহে অন্ধ। ওকে অত্যধিক আদর দাও বলেই ওর দোষ ত্রুটিগুলো তোমার চোখ এড়িয়ে যায়।

মাথা নিচু করে অপরাধীর ভঙ্গিতে কল্যাণ প্রশ্ন করলে, কিন্তু ও কি করলে তাই বলুন। আপনার কাছে কি করলে, আপনি না জানালে আমি জানবো কেমন করে?

—ওকে জিজ্ঞেস করো নি, কেন আমি কাল ওকে মেরেছিলুম?

—করেছিলুম। কিন্তু ছেলেমানুষ ও ঠিক বুঝতে পারেনি। আমি কতকটা অনুমান করেছিলুম।

হঠাৎ হেসে ফেললে কল্যাণ। হাসি চেপে মুখ তুলে বললে, আপনি তো ওকে মারেন নি। মেরেছিলেন আমাকে।

শুক্তি কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, আঘাতটা তোমার বুকে বেজেছিল তা জানি। কিন্তু ও আমার কাছে মিছে কথা বলেছিল।

—মিছে কথা বলেছিল ?

—হাঁ। আমাকে বললে কিনা তাসের কেল্লা দেখবার জন্যে মাষ্টার মশায় তোমায় ডাকছে।

—শুনেছি।

মাথা নত করে কল্যাণ চোখ বুজলে। যেন শক্তি সঞ্চয় করলে। তারপর গাঢ়স্বরে বললে, সে মিথ্যে বলেনি। আমিই বলেছিলুম।

—তাই নাকি ?

অবিচলিত দৃঢ়স্বরে কল্যাণ উত্তর দিল, আমিই বলেছিলুম। নিমু আমাকে বললে, মাকে দেখাবো কেল্লাটা। ওটা ভেঙোনা। আমি বললুম, যাও ডেকে আনো। তাইতো বলছিলুম, আমার ধৃষ্টতাকে শাস্তি দেবার জন্যে ছেলেটাকে অনর্থক মারলেন। আর ঐ রকম করে মারতে হয়! ছেলেটাকে আধমরা করে ছেড়ে দিলেন।

কল্যাণের স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। চোখ দুটি ভারি হয়ে এলো। সে চোখের জল চাপবার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে নিল। যখন মুখ ফেরাল তখন শুক্তি চলে গেছে।

শুক্তি শাসন করতে গিয়েছিল। শাসিত হয়ে ফিরে এলো। এ তার পরাজয়। হোক পরাজয়। তবু এর প্রয়োজন ছিল মনে হলো। কাল নিমুকে মেরে পর্যন্ত সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। মনে একটা পাথরের ভার চেপেছিল। কল্যাণ যেন সেই ভারি বুকচাপা পাথর খানা সরিয়ে দিয়ে তাকে স্বস্তি দিল। সে ভিতরে একটা আরাম বোধ করল। নিমুকে এমন মার আর কখনো মারেনি সে। কাল যেন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। ভাগ্যিস রমা এসে তাকে টেনে নিয়ে গেল তাই রক্ষে। শুক্তির নিজের উপর ধিক্কার এলো। নিজেকে শাসন করল। তার চোখ ভরে জল এলো। নিজেরি কেমন বিসদৃশ মনে হলো। অশোভন ঠেকল।

নিমুর আঘাত শুধু তারি বুকে বাজেনি, কল্যাণকেও আঘাত

করেছে। সেই আঘাতের বেদনা তার মুখে চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার চোখদুটি ভারাক্রান্ত হয়ে এলো।

কল্যাণ তাকে লজ্জা দিয়েছে। কল্যাণ তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তার নারীমনের নীচতা আর দীনতা। তাকে নামিয়ে দিল সাধারণের দলে। এমন ভাবে তাকে কেউ লজ্জা দেয়নি। তাকে কেউ শাসন করেনি।

এ বাড়িতে তাকে শাসন করবার, তার দোষক্রটি দেখিয়ে দেবার কোন লোক ছিল না কিংবা কারুর সাহস ছিল না। কল্যাণ স্পষ্টবাদী। সত্য বলতে তার বাধল না। নিজের ক্রটি স্বীকার করতেও যেমন কুণ্ঠিত হলো না, তার ক্রটি দেখিয়ে দিতেও দ্বিধা করল না।

তাই কি? না, নিজের অধিকারের জোরে? তার প্রতিটি কথা বিশ্লেষণ করে শুক্তির মনে হয়, কল্যাণের কণ্ঠের সুরে নির্ভুল একটা অধিকারের দাবি। নিমুর উপর যেন তার অবিচ্যুত অধিকার। সেই অধিকারে শুক্তি হাত তুলেছিল। তাব দরদী মর্মে সে আঘাত করেছিল। শুক্তির চেয়ে নিমুব উপর কল্যাণের দাবি বেশী। দরদ বেশী। শুক্তি যেন এক মুহূর্তে জেগে উঠে চোখ মেলে দেখল, নিমুর উপর কল্যাণের স্নেহের চেহারাটা। সে যেন বীজকে অঙ্কুরিত করবার [illegible] মাটির মমতার মতো।

ওদের কি জানাজানি চেনাচিনি হয়ে গেছে নাকি? নইলে বুকে এতো জোর পেল কোথা থেকে?

কল্যাণ এমন ভাব দেখাল যেন শুক্তি পরের ছেলের গায়ে হাত তুলেছে। প্রতিবেশীর ছেলেকে নিজের এলেকায় পেয়ে নির্দম প্রহার করেছে। অভিযোগের ইঙ্গিতটা অনেকটা সেই ধরনের।

নিমুকে কল্যাণ তার পর করে দিচ্ছে। সে ধীরে ধীরে নিমুর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে শুক্তির আধিপত্য কেড়ে নিচ্ছে। শুক্তির সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে। ঈর্ষার জ্বালা। তার পাঁজরের নিচে থেকে একটা বোবা ব্যথা অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে। বেরুবার পথ

পায় না। হাড়গুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল মনে হয়। সে দুহাতে পাঁজর দুটো চেপে ধরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। কী যে করবে ভেবে পেল না।

নিমুকে শুক্তি বললে, তোমার দাদু আমাদের কাশী যেতে লিখেছে নিমু। আমরা কাশী যাবো।

শুক্তির বাবা রমেশ বাবু কাশীতে বাস করছিলেন।

নিমু জিজ্ঞেস করলে, কবে মা?

শুক্তি বলল, শীগগিরী যাবো। চিঠি লিখি। চিঠির জবাব এলেই যাবো।

নিমু জিজ্ঞেস করলে, কে কে যাবে মা?

নিমুর মনোভার বুঝতে শুক্তিব বাকি রইল না। সে বললে, কেন তুমি, আমি। সরকাব মশাই।

—মাষ্টার মশাই?

গম্ভীর মুখে শুক্তি বললে, না। মাষ্টার মশাই সেখানে যাবে কেন?

একটু চুপ কবে থেকে নিমু গলাটাকে খুব মিহি করে বললে, কেন,-মাষ্টার মশায়ও যাক না। বেশ তো হবে।

প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যের স্বরে শুক্তি বললে, কেন, মাষ্টারকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবিনি? তোর মন কেমন করবে বুঝি?

নিমু টেনে টেনে আব্দারের নাকিস্বুরে বললে, গেলেই বা!

শুক্তি বললে, তোর যদি মন কেমন করে তুই বরং মাষ্টারের কাছে থাক, আমি কদিন ঘুরে আসি।

নিমু শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, ওরে বাবা, তা আমি পারবোনা।

শুক্তি তাকে বুকে টেনে নিয়ে হেসে উঠলো।

বললে, তোমার মাকেও চাই। মাস্টারকেও চাই।

অস্ফুট জড়িত স্বরে নিমু বললে, হুঁ-উ।

শুক্তি জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছ মাস্টারের সঙ্গে তোর কিসের এতো ভাব বলতো ? আমার চেয়ে তুই মাষ্টারকে বেশী ভালবাসিস রে ?

নিমু বললে, দুর্, তা কেন ?

—তবে ?

—তোমার চেয়ে কম।

—কতটুকু কম ?

—তা জানি না।

—কিন্তু মাষ্টার যখন চলে যাবে ?

—কোথা চলে যাবে ?

—অন্য কাজে। চিরদিনই কি তোর মাষ্টার হয়ে থাকবে নাকি ? ভালো কাজ পেলেই তো চলে যাবে। ওর বাড়ি ঘর নেই ?

নিমু বললে, বাড়ি ঘর থাকবে না কেন, বাড়িতে কেউ নেই। মা বাবা কেউ না।

—তোর ও তো বাবা নেই।

কথাটা আলগোছে শুক্তির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং বলে ফেলে অন্ধকারে সে জিব কাটল। বুকটা ধড়াস করে উঠল। কল্যাণের অকল্যাণ করল ভেবে। সে মনে মনে অপ্রতিভ হলো। মনটা তার আবার এলোমেলো হয়ে গেল। তার মনে হলো কল্যাণের এখানে আগমনটা তার জীবনের একটা পরমাশ্চর্য ঘটনা। যেন দৈবের চক্রান্ত। এমন অসম্ভব সম্ভব হলো কেমন করে ?

নিমু বললে, জামো মা, বাবাকে কি বলে স্তব করতে হয় ?

—কী ?

—মাষ্টার মশায় আমায় শিখিয়েছে। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।

শুক্তি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে তার গালে চুমু খেলে।

নিমু বললে, আর মা ?

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। তুমি সগ্গের চেয়ে বড়ো।

শুক্তি মিমুকে বুকে টেনে নিল। একেবারে হৃদয়ের মধ্যে।

শুক্তির মনের মাঝে একটা ইচ্ছা অশান্ত হয়ে উঠল। একটা কথা হঠাৎ তার মনের দোরে এসে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু কী সে ইচ্ছা আর কি কথা নিজেই বুঝতে পারল না। নিজেকে একটা স্বপ্ন, একটা হেঁয়ালি মনে হলো।

॥ নয় ॥

যারা ভাবে বেশী তারা কথা বলে কম। স্বভাবত শুক্তি অল্পভাষী। তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য তার সৌন্দর্যে একটা দেবীভাব দিয়েছিল। সে রূপ প্রসন্ন প্রশান্ত। মুখখানি কমনীতায় করুণ। চোখে স্নিগ্ধনত দৃষ্টি। নিঃশব্দ হাসিতে বরাভয়। কিন্তু হঠাৎ যেন সে মৌনী হয়ে গেল। মুখে নেমে এল শ্রাবণ সন্ধ্যার বিষণ্ণতা। দৃষ্টিতে জলভারানত মেঘের আর্দ্রতা।

শুক্তি যেন বদলে গেল।

সর্বক্ষণ সে একটা ক্লান্তিকর চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকে। সে যেন নিজেকে কঠিন করে তোলরার জন্য তপস্যা করছে। এমনি রাশভারী হয়ে উঠল সে, যে তাব কাছে গিয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলা দায় হয়ে উঠল। নিমু ছাড়া আর কারুর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে সে কথা বলে না। মন যেন তাব নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে থাকে। কিসেব এই ব্যথা, কিসেব এই ভাবান্তর নিজেই অন্তব দিয়ে বুঝতে পাবে না তা পরে বুঝবে কেমন করে? চোখ দিয়ে বোঝবার ব্যথা তো নয়।

রমা ভাবে। কল্যাণ ভাবে। রমা কল্যাণের ভাবনাকে খুঁচিয়ে তোলে।

কিন্তু তার এই নতুন ভাবধারার বন্যাকে ঠেকাবে কে? কল্যাণের বুঝতে বাকি থাকে না, ঢেউ উঠেছে ওর মনের উপকূলে। ঢেউ কাটবার জন্য ও লড়াই করছে।

নিজের মন দিয়ে কল্যাণ ওকে বোঝবার চেষ্টা করে। লজ্জিত হয় মনে মনে। নিজের উপর ধিক্কার জাগে। কেন, জানে না, তবু তার নিজেকে যেন দায়ি মনে হয় ওর এই পরিবর্তনের জন্য।

সকালের রোদ্দুরে বসে শুক্তি উল বুনছিল। মাথায় কাপড় নেই। চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। মুখের উপর সকালের সোনালি আলো ঝলমল করছে। কালো চুলের উপর আলোছায়ার নক্সা।

খবরের কাগজ নিতে এসেছিল কল্যাণ। শুক্তিকে দেখে দাঁড়াল।

শুক্তি আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে নির্লিপ্ত স্বরে বললে, কিছু বলবে?

—আপনি কাশী যাবেন শুনছিলুম না?

—হাঁ। বাবাকে দেখতে যাবো। কে বললে? নিমু বুঝি?

—হাঁ। কিন্তু এর জন্যে আবার তাকে শাস্তি দেবেন না যেন।

শুক্তির চোখদুটি মুহূর্ত জ্বলে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। তার কানের আর নাকের ডগাগুলো লাল হয়ে উঠল। সে মাথা নত করল। কোন কিছু বললে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কল্যাণ বললে, আপনি দিনকতক ঘুরে আসুন। এখানে আপনার শরীর ভাল থাকছে না। আর—

কল্যাণ তার মুখপানে চেয়ে থামল। কথাটা যেন বলতে গিয়ে বলতে পারলে না। তার বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরটা শুক্তিকে উচ্চকিত করে তুলল। সে প্রশ্নভরা বড়ো বড়ো চোখে তার পানে মুখ তুলে চাইল।

তাকে বড়ো শূন্য দেখাল। তার মুখে একটা অব্যক্ত বেদনার ছাপ। শুক্তি অসঙ্কোচে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার মুখপানে চেয়ে রইল।

কল্যাণ মাথা নিচু করে মেঝের পানে চেয়ে প্রার্থনার সুরে বললে, আর আমাকে ছুটি দিন।

—কেন, হঠাৎ?

কথাটা বলতে পেরে কল্যাণ যেন মনে জোর পেলে। সে পরিষ্কার গলায় স্বচ্ছস্বরে বললে, সে কথা নাই শুনলেন।

একটু থেমে গলায় আরেকটু জোর দিয়ে বললে, আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। এখানে থাকা আমার উচিত নয়। আপনিও আমাকে আর সইতে পারছেন না।

শুক্তি সোজা হয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে বললে, আমার কথা আমি বুঝবো। তোমার কথা বলো।

কল্যাণ বললে, আমার সব কথাই যে আপনার জন্যে। আমার ভবিষ্যৎ নেই। ভাববার ও কিছু নেই। আমার মনের বিশ্বাস, যে কারণেই হোক আমি আপনাকে বিব্রত করে তুলেছি। এবং আপনার মনের পূর্বশান্তি নষ্ট করে দিয়েছি। কাজেই সর্বদিক ভেবে আপনার মঙ্গলের জন্যই আমাকে বিদায় নিতে হবে।

শুক্তির মুখের রক্ত উবে গেল। পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে সে মাটির পানে চাইল। তার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে চেপে ধরেছে মনে হলো। সে নির্জীবের মত স্তব্ধ হয়ে রইল।

তার মরণোন্মুখ আনত ভঙ্গির পানে চেয়ে কল্যাণ ব্যথিত হল।

শুক্তির আত্মসম্মান আহত হল। 'আপনার জন্য' 'আপনার মঙ্গলের জন্য' কথাগুলো বিষাক্ত তীরের মত তার হৃদয়ের গভীরে গিয়ে বিঁধল। সে অপমানে ও ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। সে হঠাৎ দৃপ্তিভঙ্গিতে মাথা তুলে ক্রোধকম্পিত স্বরে প্রশ্ন করল, আমার ভালমন্দর দায়-দায়িত্ব, আমার মঙ্গল অমঙ্গলের ভয়-ভাবনা তোমাকে এমন বিব্রত করে তুলল কেন বলতে পারো ?

কল্যাণ নিঃসঙ্কোচে গাঢ়স্বরে উত্তর দিল, বোধ হয় আপনাকে স্নেহ করি বলে। ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি বলে।

বাঁশীর সুর উদ্যত ফণা সাপিনীকে অবশ করে দিল। কল্যাণের অদ্ভুত কোমল কণ্ঠস্বরের প্রভাবে শুক্তি অভিভূতের মত মাথা নিচু করল। তার সব আক্ষেপ সব অসন্তোষ নিমেষে যেন শান্ত হয়ে গেল। নিভে গেল অপমানের ক্ষুব্ধ জ্বালা।

কী যে বলবে ভেবে না পেয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে সে বাইরের নীল আকাশের পানে চেয়ে চুপ করে রইল।

কল্যাণ ও কিছুক্ষণ নীরব হয়ে তারপানে চেয়ে রইল। তার কাৎ হয়ে বসার এই অপরূপ ভঙ্গিটি কল্যাণের সুন্দর মনে হল। পুরোপুরি

মুখটি চোখে পড়ে না। রোদের ঝলক পুড়ো আধেক মুখ। ঢেউ তোলা গাঢ় কালো চুল। রক্তিম একটি গাল। কোলের উপর পশমের বাণ্ডিল। জড়ো করা হাতে কাঠিতে জড়ানো বোনা উল। শরীর তার মজবুত নয়। প্রেমের জন্য অতীতে যে সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে তার চিহ্ন তার শরীরে আজো বিদ্যমান। শরীর নয় যেন হালকা রঙে সূক্ষ্ম তুলির আলপনা।

কল্যাণের হৃদয় যেন চূর্ণ। একটা অজানা ব্যথার ভারে ভেঙ্গে পড়ছে।

শুক্তি মুখ ঘুরিয়ে ভঙ্গিটাকে কঠিন করে তুলে শ্লেষ জড়িত স্বরে বললে, আমাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা, নিমুকে এত ভালোবাসা, তবু বিদায় চাইছো কেমন করে?

—নিরুপায় হয়ে।

কল্যাণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো বাষ্পে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। সে নিজেকে সংবরণ করবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে ক্ষিপ্রপায়ে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলো।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল শুক্তি। তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো।

শুক্তি ভয় পেয়েছে।

কল্যাণের চাঞ্চল্যকর ভাবগতিক দেখে শুধু সে বিস্মিত হয়নি, রীতিমত ভয় পেয়েছে।

সকাল থেকে সারাদিন সে শুধু কল্যাণকে ভেবেছে। এই ভাবনাটাই তার কাছে সব চেয়ে কুৎসিৎ আর যন্ত্রণাদায়ক। কিছুতেই এ চিন্তার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পায় না। শুধুই কি কল্যাণকে সে ভাবছে, সে কল্যাণকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করছে। তার প্রতিটি কথার ও মুখের ঢেউকে একত্র করে সে বিচিত্র ব্যাখ্যায় ব্যাখাত করছে। আজ

কল্যাণের মুখে সে নতুন কিছু দেখেছে। চমকে গেছে তার মুখের ভাবে। তার কণ্ঠের কোমলতায়। তার দৃষ্টির কুহকে।

চিন্তার তমসায় সে সমাচ্ছন্ন। যে-সব চিন্তার সঙ্গে তার কোন-দিন পরিচয় ছিল না। বিশ্রী ও কদর্য মনে হলেও এ চিন্তা তার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বর্ষণ করে। চকিত হয়ে বেড়ায় অগ্নিধারায়।

শুক্তির মনে হয় কল্যাণের মনে পাপ বাসা বেঁধেছে। তার বিড়-ম্বিত জীবনে ব্যর্থতার জোয়ার এসেছে। সে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে। নিজেকে ঢেকে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পারছে না সে নিজেকে সামলাতে। পারছে না তার অতিসাবধানী সংযমী মনকে আয়ত্তে আনতে। তার এই নিষিক্ত মনোভাবকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। তাই এই সতর্কতা।

সে শুক্তির অন্ধকার বৈধব্যের তপশ্চর্যায় আশা আকাঙ্ক্ষার আলো জ্বালতে চায় না। তার নিরালা পূজার ঘরের নির্জনতা ভেঙ্গে তার শুচিতা নষ্ট করতে চায় না। তাই সে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে তার দৃষ্টির বাইরে নিয়ে যেতে চায়। এখান থেকে সে বিদায় নিতে চায়।

কল্যাণ বলেছে, এখান থেকে তাকে বিদায় নিতে হচ্ছে নিরুপায় হয়ে।

কিসের এই নিরুপায়তা?

এ যেন শুক্তিকে বাঁচাবার জন্যই নিজেকে ক্ষয় করা।

শুক্তির আত্মনির্ভর আহত হয়। সতীত্বগৌরব ব্যথিত হয়। তার মনের আকাশ তো বিবর্ণ নয়। কুয়াশায় মলিন নয়। মনের আকাশ তার নীলিমায় ভরা। স্বামার স্মৃতির দুর্ভেদ্য প্রাচীর তার চারিদিক ঘিরে আছে। সেখানে সে দুর্জয়। দুর্লঙ্ঘ্য। আসলে এ তার নিজের মনের বৈকল্য।

গুটি থেকে বেরিয়ে প্রজাপতি পাখা মেলেছে। উড়ে এসে ফুলের পাপড়িতে বসতে চায়।

শুক্তির গা সির সির করে। সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয় একটা অজানা ভয়ে।

রাতের অন্ধকারে চোখ বুজে সে ঘুমন্ত নিমুকে আঁকড়ে ধরে। নিমুর কবোষ্ণ স্পর্শ তাকে চকিত করে তোলে। নিমুর মাঝে কল্যাণ ঘুমিয়ে আছে। নিমুর দেহে কল্যাণের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। নিমুকে ঘিরে কল্যাণের সংস্পর্শের তাপ। শুক্তি শিউরে ওঠে। তার মনে হয় তাদের এই নিভৃত শয্যায় নিমুর পাশে কল্যাণ সুষুপ্ত। অন্ধকারের নিঃশব্দতায় তার বলিষ্ঠ দেহ তাপ বিকীরণ করছে। নিষুপ্ত ঘরময় উৎসারিত হচ্ছে তার পৌরুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রশান্তি।

এ যেন তার অধিকার। নিমুর স্বত্বে সে স্বত্ববান্। নিমুর পিতা সে। নিমু তার রক্তের ছন্দ। শুক্তির মনে হয় নিমু তাদের যোজক। নিমুর মধ্যে দিয়া তাদের দুজনের একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সে সম্পর্ককে সে অস্বীকার করবে কেমন করে? সে সম্পর্ককে অস্বীকার করলে নিমুকে অস্বীকার করতে হয়।

নিমু দুজনের দুহাত ধরে তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। নিমুই তাদের কাছাকাছি এনেছে। তাদের সান্নিধ্যকে নিবিড় ও নিটোল করে তুলেছে।

নিমুর মধ্যে দিয়েই সে কল্যাণকে প্রত্যক্ষ করেছে। নিমুর জন্ম-দাতা, নিমুর স্রষ্টা জেনেই তাকে সে প্রীতির চোখে দেখেছে। তাকে আপনজন ভেবেছে।

নিমুর গায়ে হাত রেখে সে অন্ধকারে নিঝুম হয়ে রইল। চোখ-বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম তার আসবে কেন? মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আগুনে ঝড়। তার সমস্ত শরীর তেতে উঠল। ভিতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে মনে হলো। নাকের ডগা আর ছিদ্র দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। মুখ খানা যেন পুড়ে যাচ্ছে মনে হলো।

তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সে বিছানায় উঠে বসলো। আকণ্ঠ জলপান করল।

মুখে চোখে জল দিয়ে খোলা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

অন্ধকার আকাশের অসীম বিস্তারের পানে চেয়ে আবার তার মনে জাগল কল্যাণের কথা। কী অভিশপ্ত জীবন। সব পেয়েও কিছুই পেল না। হাতের মুঠো থেকে সব স্খলিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। অনাদরে আদরের সামগ্রীকে চরণে দলিত করে রিক্ত হাতে চলে গেল একা। বিতৃষ্ণায় পিছন ফিরে তাকাল না। জীবনকে অবজ্ঞা করল। এতটুকু মমতা করল না। চাওয়া পাওয়ার কোন ধার ধারল না। অথচ তার জীবনে একটি অতৃপ্তির করুণ ছায়া। তার মহত্বকে অস্বীকার করা চলে না। তার চরিত্রের মাধুর্য তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি তার নির্ভীক মতবাদকে প্রশংসা না করে উপায় নাই।

সে ক্লিষ্ট। অসহায় সে।

শুক্তির মনটা দাক্ষিণ্যে ও করুণায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

ঘরের জানলা থেকে বার-বাড়ির উঠোনটা চোখে পড়ে।

উঠোন পার হয়েই সদর দরজা। হঠাৎ শুক্তির মনে হলো কে যেন উঠোন পেরিয়ে সদরের দিকে এগিয়ে গেল।

চমকে উঠলো শুক্তি।

কল্যাণ নাকি ?

শুক্তির চিৎকার করে সাড়া দিতে ইচ্ছা হলো।

ঝাপসা অন্ধকারে সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ঠিক কল্যাণের মতই তার মনে হলো।

চঞ্চল হয়ে উঠলো শুক্তি। কল্যাণ কি তবে রাতের অন্ধকার গোপনতায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেল ?

শুক্তি ছটফট করতে করতে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াবে কি ? কে যেন অদৃশ্য হাতে ধাক্কা দিতে দিতে তাকে অন্ধকারে বারান্দা পার করে কল্যাণের ঘরের দরজায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

ঘরে আলো জ্বলছে। দরজাটা ভেজানো। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের ভিতরটা চোখে পড়ে।

শুক্তি নিঃসংশয় হলো। ঘরের মাঝে কল্যাণকে দেখে। কল্যাণ আতুব গায়ে ঘরের মেঝেয় অস্থির ভাবে পায়চারি করছে।

রাত তিনটে। ঘড়িতে বাজতে শুনে এসেছে শুক্তি। কল্যাণ ঘুমোয়নি। তারি মতো সেও অতন্দ্র আর অস্থির। ঘুম তাকে দয়া করেনি। চিন্তা তাকে অব্যাহতি দেয়নি।

বেদনার ও কারুণ্যের প্রতিমূর্তির মত কল্যাণ ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা গভীর দুঃখ আর অনুশোচনায় ও যেন অভিভূত।

শুক্তি মূঢ় বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাব পানে চেয়ে দেখল। তার আতুর দেহের পেশল স্বাস্থ্য দেখে সে মুগ্ধ হলো। তাব শক্তি ও পৌরুষ যেন তার সর্বাঙ্গে ঝলমল কবছে। তাকে আরো দীঘল ও বলিষ্ঠ মনে হলো। প্রশংসাস তার দু'চোখ উদ্দীপ্ত হযে উঠলো। সে নিজেকে ভুলে গেল। একটা ভাবেব ঘোবে মগ্ন হয়ে সে দোবে৭ আড়ালে অন্ধকার আশ্রয় কবে দাঁড়িয়ে বইল।

আচমকা একটা দমকা হাওয়াব দাপটে দোর দুটো হাট হয়ে খুলে গেল।

আলোর বন্যায় শুক্তি ভেসে উঠলো।

—কে?

কল্যাণ দবজাব বাইবে একেবাবে তাব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাটা নিমিষেব। কিন্তু লজ্জাটা শুক্তিব কাছে জীবনজোড়া। কল্পান্তেব। এতো বড় লজ্জায় এমনভাবে আজ অবধি কখনো তাকে পড়তে হয়নি। তাকে যেন উলঙ্গ কবে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি রইলো না। তার বিদ্যুৎ শক্তির মত লজ্জাটা তার সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হলো। সে কুঁকড়ে গুটিয়ে গেল। দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে।

শুক্তি —তুমি?

বিস্ময়ের কণ্ঠ থেকে চাপা গভীর অন্তরঙ্গ সুর নির্গত হলো।

আজ প্রথম কল্যাণের কণ্ঠে তার নাম উচ্চারিত হলো।

বিস্ময়ের আর একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো শুক্তির লজ্জিত মনের আকাশ জুড়ে। বাজ পড়বে তার মাথায়। এ তারি ইঙ্গিত। নিজেকে লুকিয়ে রেখে কোন লাভ নেই।

মাথায় ঝাঁকান দিয়ে শুক্তি সোজা হয়ে কল্যাণের চোখে চোখ রেখে দাঁড়াল। রূঢ় দৃষ্টিতে। বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে কপালের উপর থেকে চুল গুলোকে সরিয়ে দিল।

মাথা নিচু করে কল্যাণ ডাকলে, ভেতরে এসো।

চৌকাট পার হয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে শুক্তি ঘরে ঢুকলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিল নিজের হাতে। কল্যাণ সন্তর্পনে সরে দাঁড়াল। সে মুখ তুলে শুক্তির পানে তাকাতে পারলে না। তার আতঙ্কিত কণ্ঠ হতে অস্ফুট উচ্চারিত হলো, ব্যাপার কী? নিমুর শরীর ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ, সে ঘুমোচ্ছে। তার জন্য নয়। আমি তোমাকে একটা দরকারি কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলুম।

—বলো।

শুক্তি তার কথার জবাব দিল না। নিঃশব্দে, অবিকম্পিত দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে কাতরতা নেই, আছে উপলব্ধির গভীরতা। তারুণ্যের সমস্ত নৈরাশ্য পেরিয়েও সে দৃষ্টিতে পরিপূর্ণতার আভাস। সে দৃষ্টি কামনায় বিবর্ণ নয়।

শুক্তি শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, না। আর বলবার প্রয়োজন হবে না। আমি যা জানতে চেয়েছিলুম, তা জেনেছি। তোমাকে যে প্রশ্ন করতে আমার মনে সঙ্কোচ ছিল তার উত্তর আমি পেয়েছি।

কল্যাণ নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। রাত্রির মোহজড়ানো মায়াভরা মুখ। নিষুপ্ত রাত্রির নিভৃত নিরালায় এই সুন্দরী মেয়েটির উপস্থিতি ও ক্ষণ পরিচয় তার কাছে একটা অভাবিত পরমাশ্চর্য ঘটনা মনে হলো। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তার স্মরণাগারে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শুক্তি বললে, না। তোমাকে আমি ধরে রাখতে চাই না। তোমাকে যেতেই হবে এখান থেকে। নিমুকে তোমায় হারাতে হবে। কোন উপায় নেই।

বিচারকের শেষ কথার মত শুক্তির কথাগুলো কল্যাণের বুকে গিয়ে বাজল। শুক্তি তাকে নির্বাসন দণ্ড দিল। আবার তাকে তার বিচ্ছিন্ন একাকীত্বে ঠেলে দিল।

নিঃশব্দে কল্যাণ মাথা নিচু করে চোখ বুজল।

শুক্তি বললে, তোমাকে নিমুর কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া আর নিমুকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া দুজনের পক্ষেই মর্মঘাতী। কিন্তু এ দৈবের নির্বন্ধ। আমাদের ইচ্ছা দৈবাধীন। এ আঘাত আমাদের বুক পেতে নিতেও হবে এবং সহ্য করতেও হবে।

একটু থেমে শুক্তি মিনতির সুরে বললে, তবে নিমুকে এ আঘাতের তীব্রতা থেকে রক্ষা করবার জন্যে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে আশা করি—

কল্যাণ নিঃশব্দে মাথা তুলে তার মুখের পানে তাকাল।

শুক্তি বললে, আমি দুচারদিনের মধ্যেই নিমুকে নিয়ে কাশী যাবো। সে কটা দিন তুমি এখানে থাকবে আর নিমুকে কোন কিছু জানাবে না। বরং সে যাতে নিঃসংশয়ে তোমাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে যায় সেই ভাবে তাকে একটু বোঝাবে। নইলে সে তোমাকে সঙ্গে নিতে চাইবে।

কল্যাণ একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করল।

শুক্তি ব্যথিত হলো তার ভগ্নভঙ্গি দেখে। একটু চুপ করে থেকে সে আর্দ্রকণ্ঠে বললে, আমরা চলে গেলে তুমি যখন ইচ্ছা এখান থেকে যেয়ো। তুমি চলে গেলে আমরা ফিরে আসবো। তোমাকে ভোলাবার জন্যে আমার মনে হয় বেশ কিছুদিন ওকে নিয়ে আমাকে বাইরে থাকতে হবে।

কল্যাণ শূন্য দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে নিরাশার শুষ্ক কণ্ঠে বললে, তা ছাড়া আর উপায় কি?

শুক্তি তার সঙ্ক্ষিপ্ত আঁচলটা মাথায় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কল্যাণ ও সঙ্গে সঙ্গে উঠলো, সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে। তাকাল তার পানে কম্পিত দৃষ্টি তুলে।

শুক্তি ক্ষিপ্রগতিতে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, না কোন উপায় নেই। নিজেদের সম্মান বাঁচিয়ে একসঙ্গে থাকার আর কোন উপায় নেই।

কল্যাণ শুক্তির কাছে ছুটি চেয়েছিল। শুক্তি মঞ্জুর করেছে তার আবেদন। তাকে ছুটি দিয়েছে।

এখানকার জীবন তার শেষ হয়েছে। এবার তার প্রত্যাবর্তনের পালা। ফিরে যেতে হবে আবার সেই অতীতের নিরাশ্বাস নৈরাশ্যে। সেই নিঃসঙ্গ একাকীত্বে। জীবন আরম্ভ হবে নতুন অধ্যায়ে।

অতীতের জীবন ছিল তার বিকৃত ও বীভৎস। ঘটনাবহুল, ভয়াবহ রোমাঞ্চকর জীবন। সে জীবনের ভূমিকা ছিল একান্ত হিংস্র, নির্মম ও কঠোর। পটভূমি ছিল তামসী অমানিশার মহাশ্মশান। সেখানে ছিল না কোন প্রীতির মায়াডোর। ছিল না সৌন্দর্যের উপলব্ধি। ছিল না আনন্দের অনুভূতি।

ধারা তার জীবনের সান্ত্বনাহীন ব্যর্থতাকেই মনে পড়িয়ে দেয়।

শুক্তির এই সৌন্দর্যের মায়াপুরীতে এসেই সে স্পর্শমণির স্পর্শ পেল। সে চোখ মেলে তাকাল। এসেছিল জীবিকার সন্ধানে। জীবনের সন্ধান পেল। সৌন্দর্যের দৃষ্টি পেল। রচনা করল একটি মায়াময়, রূপময়, স্বপ্নময় জগৎ। অন্তরে পেল পরিপূর্ণ প্রশান্তি।

কল্যাণের মনে হতো এ যেন তার বহুপূর্ব অতীতের প্রতিধ্বনি। মনে পড়িয়ে দিত তার শৈশবকে। মনে পড়িয়ে দিত তার মাকে। মনে পড়িয়ে দিত একটি নিরুদ্বেগ সহজ সুন্দর জীবনধারাকে।

সে শান্তির নীড় তার ভেঙ্গে গেছে। একটা প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে তাকে আশ্রয়চ্যুত করে তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

নিজেকে তার শূন্য ও অপচিত মনে হল। লজ্জিত ও ধিক্কৃত মনে হল।

শুক্তি তাকে লজ্জা দিয়েছে।

শুক্তির অসামান্য সৌন্দর্য সুষমার মধ্যে একটি অপূর্ব মাতৃহৃদয় তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সেই মাতৃহৃদয়ের উদার বিস্তারের সঙ্গে নিমুর প্রতি নিজের বিস্ময়কর বাৎসল্যকে মিশিয়ে দিয়ে সে মধুর স্বপ্ন দেখেছে। অজ্ঞাত পিতৃহারা নিমুর পিতার স্থানটিতে নিজেকে কল্পনা করে সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। নিমুর চিন্তা, নিমুর কল্যাণ। নিমুকে নিয়েই তাদের যত কিছু জল্পনা কল্পনা। তাকে আশ্রয় করে সে এক অভিনব সুন্দর জগতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সে এক অপূর্ব সুন্দর রূপ-জগতের দর্শন পেল। পূর্ণ মাতৃত্বের জ্যোতির্ময়ী আত্মা যশোমতীর মত অপরূপ লাবণ্যময়ী শুক্তি তার অতীতের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে এক নবজীবনের তীর্থঘাটে এনে পৌঁছে দিল। বিদ্যুৎ-বিদারিত মরুমাঠ শষ্পাবরণে ভরে উঠল। নিষ্পত্র শুকনো ডালে ফুল ফুটলো। গলার রুদ্রাক্ষ ফুলের মালা হয়ে উঠল।

শুক্তি তার সৌন্দর্য চেতনাকে বিভাসিত করে তুলল! তার পত্নীত্বের বিস্ময়কর কাহিনী, তার অসামান্য পাতিব্রত্য, তার প্রথম যৌবনের রহস্যপূর্ণ অন্তঃকরণের অভূতপূর্ব প্রেমের পরিচয়, নিমুর জন্মবৃত্তান্ত তার মনকে এক স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করে দিল। শুক্তির প্রতি অনুরাগে মন তার রাঙা হয়ে উঠল। সে অনুরাগ ভক্তি শ্রদ্ধার চন্দনলিপ্ত। কামনা লালসায় জর্জরিত নয়। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে তার পূজা মন্দির। সে তো চোখে পড়বার কথা নয়।

তবু কেন তাকে এ লজ্জা, এ অ-গৌরব সইতে হলো?

না। না। এর মাঝে সৌন্দর্য নেই। গৌরব নেই। এ

ফুলবাগানে দূষিত বায়ু। এ দেবমন্দিরে পচা আবর্জনা। দেবীর গায়ে আঁচ লেগেছে। দেবী ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

নারীর সম্ভ্রম, নারীর সুনাম বিপর্যস্ত। এর জন্য দায়ী সে। নিঃসন্দেহ সেই দায়ি! তার গভীরতম অন্তরের চিরন্তন সত্যকে সে অস্বীকার করবে কেমন করে? এ তো মিথ্যা নয়। ভালবাসা সত্যকার বলেই না এই বিচ্ছেদ-কল্পনা এত মর্মান্তিক। জীবনে তার প্রেমের এই প্রথম উন্মেষ। এ অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদনার অনুভূতির এই প্রথম উপলব্ধি। এর মাঝে অসীমতার চেতনা আছে। এ ধ্রুব সত্য। এর দেখা পাওয়া তার জীবনের পবম সৌভাগ্য।

এতক্ষণ চোখ বুজেই সে শুয়েছিল। পাশ ফিরে চোখ খুলতেই দেখল সকালের সোনালি রোদে বিছানা ভরে গেছে। বেলা হয়েছে। রোদ ওঠবার অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে ওঠা তার চিরদিনের অভ্যাস!

সে ওঠবার চেষ্টা করলে। উঠতে ইচ্ছে হলো না। বিছানাটা যেন তার আড়ষ্ট দেহকে আকড়ে ধরে আছে। ছাড়তে চায় না। সে বিছানা থেকেই কম্পিত চোখ মেলে আলোকোজ্জ্বল ঘরখানার পানে তাকাল। মনে হলো ঘরখানাকেও সে ভালোবেসেছিল। পরম স্নেহে ও গভীর মমতায় ঘরখানা তাকে জঠরে স্থান দিয়েছিল। তার চোখ জ্বালা করে এলো। অলস ক্লান্ত চোখ বুজে আবার সে পাশ ফিরলো। দিনের আলো তার চোখ সইতে পারছে না। চোখ বুজে শুয়ে থাকতেই তার ভাল লাগে। আর উঠেই বা সে করবে কী? তার কাজ ফুরিয়েছে। তার জীবনে আর কোন কাজ নেই। জীবনের রূপ নেই। ছন্দ নেই। সুর নেই।

নিজেকে তার সর্বহারা মনে হলো। সঙ্গীহীন। শক্তিহীন।

ধরাম করে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলো রমা।

—ও মা! দরজা খোলা রয়েছে তা জানবো কেমন করে?

কল্যাণ পাশ ফিরে তাকাল।

রমা এগিয়ে এসে উদ্বেগ ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কী গো এখনো শুয়ে আছো যে? শরীর ভালো নেই বুঝি?

কল্যাণ সজাগ হয়ে উঠল। মনে পড়ে গেল শুক্তি রাত্রে ঘর থেকে যাবার সময় দরজাটা নিজের হাতে ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সে হঠাৎ উঠে বসে ঘরময় চোখ বুলিয়ে নিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল, কোথাও কোন চিহ্ন আছে কিনা। তার বুক দুলে উঠল, তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল পাছে রমার চোখে ধরা পড়ে।

কল্যাণের মনে হলো, ঘরের বাতাসে শুক্তির দেহের সৌরভ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরের মেঝেয় তার পায়ের চিহ্ন রয়েছে। দরজার যে পাল্লাটি ধরে সে দাঁড়িয়েছিল তার গায়ে তার আঙুলের ছাপ রয়েছে।

কল্যাণ রমাকে ঘর থেকে বিদায় করবার জন্য বললে, শরীর ভালো আছে। তুমি যাও।

—ভালো আছে বললেই হবে? আর্শিতে মুখখানা একবার দেখোনা। চোখ দুটো নেশাখোরের মত রাঙা হয়েছে। মুখখানা চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। একরাতে যেন বুড়ো হয়ে গেছো।

রমা চোখ পাকিয়ে তার কপালে হাত রাখল।

তার মমতাভরা স্নেহের স্পর্শে কল্যাণের চোখ দুটি ভারি হয়ে এলো।

এই স্নেহের রাজ্য থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে। রমাকে সে কী বলবে? কি কৈফিয়ৎ দেবে? নিমুর মত একেও অন্ধকারে রেখে যেতে হবে।

॥ দশ ॥

অন্ধকারে এরকম হোঁচট খেতে খেতেই শুক্তি দীর্ঘ বারান্দা পার হয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। ঘরের মাঝে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। দরজার পাশে অন্ধকার আশ্রয় করে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। নিজেকে তার অশুচি মনে হলো। নিসুপ্ত রাত্রির অন্ধকারের গোপনতায় গা ঢেকে সে পরপুরুষের ঘর থেকে ফিরে এল। নিজের এই অস্বাভাবিক আচরণে ও আকস্মিক দুঃসাহসিকতায় সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

এর কি আর কোন ব্যাখ্যা হয় নাকি?

আর কেউ না জানুক নিজের অন্তরকে সে প্রবোধ দেবে কী বলে? সে যে তার আজন্মের সংস্কারকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে এলো! তপস্যার জীবনে দুর্নীতির পাঁক মেখে এলো। বৈধব্যের পূণ্যময় ব্রতকে কলুষিত করে এলো।

রইলো কী জীবনে?

আত্মসম্মান হলো পদদলিত। স্বামীর পূণ্যময় স্মৃতি হলো অপমানিত। নারীত্বের সব শুভ্রতা হলো অপবিত্র। অশুদ্ধ।

রইলো কী? কল্যাণের শ্রদ্ধা পর্যন্ত হারাল।

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তার দেহ কাঁপছে। পরাজয়ের লজ্জায় তার পা টলছে। তার মনে হলো এখুনি সে পড়ে যাবে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে দরজার বাজুটা দৃঢ়-মুষ্টিতে চেপে ধরল। দাঁতে ঠোঁট চেপে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

অন্ধকার শয্যার প্রান্তে ঘুমন্ত নিমু উস্‌খুস করে উঠলো। শুক্তির বুকের তলাটা দুলে উঠলো। কিন্তু তার বিছানায় যেতে পা উঠলো না। নিজেকে অপবিত্র মনে হলো। ও শয্যার আশ্রয়ে তার অধিকার নেই।

মনে তার ছায়া ছিল বই কি! একটা রঙিন ভাবের ঘোর ছিল। সেই ভাবের কুহকেই সে অচেতনের মত ভাসতে ভাসতে কল্যাণের দোরে গিয়ে উঠেছিল।

কল্যাণের জন্য তার মনে কোন ঔৎসুক্য না থাকলেও নিমুর পিতা তাকে আকর্ষণ করেছিল। তার মাতৃত্বকে আলোড়িত করেছিল। তার উৎপীড়িত মাতৃত্ব কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে নিমুর অপরিচিত পিতাকে স্বাগত জানিয়েছিল চোখের মৌন ভাষায়। নিমুকে তার জন্মদাতার স্নেহাশ্রয়ে দেখে সে অন্তরে একটা পুলক অনুভব করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জননী সত্তাকে কল্পনায় তাকে নিবেদন করে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল।

সে নিমুর মা। সে ধারার বিকল্প।

ছায়া ছিল বই কি তার অন্তরের গভীরে।- ভাবলুতায় আর্দ্র হয়েছিল তার তৃষিত মাতৃত্ব। কল্যাণের পিতৃত্বকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছিল তার বৎসলতার সাথি হয়ে।

কাঙালপনা ছিল বই কি তার অন্তরের নিভৃতে। নইলে সে অন্ধের মত এমনভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলতো না। নিজের ব্যক্তিত্বের উপর আর তার কোন শ্রদ্ধা নেই। অতি সাধারণ নারীর মতই সেও মূঢ়, অসহায়। আত্মহারা মন তার কলুষিত। হৃদয় অপবিত্র। অসুন্দর তার আত্মা।

অপরিসীম লজ্জায় ও ধিক্কারে সে নিজের মৃত্যু কামনা করল। দিনের আলোয় এ মুখ যেন আর তাকে দেখাতে না হয়।

কিছুক্ষণ পরে সে কী ভেবে হঠাৎ স্খলিত চরণে ঘর থেকে বেরিয়ে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

হুড়-হুড় করে মাথায় জল ঢেলে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করল।

যখন বাইরে এলো, অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। পাশের আস্তাবলে মোরগ ডাকছে।

সে শয্যা স্পর্শ করল না।

নিমু ওঠবার আগেই সে ঠাকুর ঘরে ঢুকলো। শূন্য মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সে আত্মশুদ্ধি করতে চায়। প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

মা ঠাকুরঘরে জানতে পেরে নিমু আর তাকে ডাকাডাকি করল না। মায়ের নিষেধ। নিমু রমাকে খবর দিল। কোন ভোরে উঠে মা ঠাকুরঘরে দরজা দিয়েছে।

রমা তাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললে, আমি দেখে এসেছি। তুমি দুধ খেয়ে মাষ্টারের কাছে যাও।

দ্বিপ্রহর বেলায় শুক্তি পূজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রমাকে বললে, তোমরা সব খেয়ে নাও। আমার উপোস।

—আজ আবার কিসের উপোস গো ?

শুক্তি তার কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল, নিমু কোথা ? তাকে আমার কাছে ডেকে দাও।

শুক্তি আশ্চয। স্বভাবিত।

অবাক হয়ে রমা তার মুখের পানে তাকাল। শুক্তির মুখে একটি স্বাভাবিক গাম্ভার্য আছে। গভীর মধ্য সাগরের গাম্ভীর্য। সেই গাম্ভীর্যকে রমা চিরদিন সমীহ করে এসেছে। সম্মান দিয়েছে। সে গাম্ভীর্যকে ঘুলিয়ে দেবার সাহস হয়নি তার। যদিও এ বাড়িতে সেই তার সবচেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। তার এই গাম্ভীর্যকে রমা বলতো দৈবমাধুর্য। দেবতা ওকে ভর করে আছে। কিন্তু আজকের এই রূপ তার অদেখা। এ মাধুর্য-অলৌকিক। শুক্তি চিরদিন ভক্তিমতী। আচারনিষ্ঠ। ঐশ্বর্যশালিনা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য তার অভিনব। তার সৌন্দর্য্যের বিভূতি দেখে রমা চমকে গেছে।

চমকে যাবারই কথা।

তমসাচ্ছন্ন দুর্যোগের রাত্রি পেরিয়ে যে মেয়ে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলো তার মুখে কেমন করে ফুটলো এই সূর্যের খরদীপ্তি! এর যে সবটাই প্রসন্ন প্রশান্ত। মুখের কোন প্রান্তে নেই এতটুকু

উদ্বেগ অধীরতা। চোখে নেই অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি। অনুতাপ অনুশোচনার গ্লানি। মন যেন তার অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে আছে। সে যেন সদ্য মুক্তিস্নান করে মনের সব মলিনতা ধুয়ে মুছে এসেছে। কোথাও নেই কোন ছায়া। সবটাই স্বচ্ছ। সবটাই জ্যোতির্ময়।

রমা চোখ তুলে শ্রদ্ধানম্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তা হলে তুমি কী খাবে? দুধ সন্দেশ?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে শুক্তি উত্তর দিল, কিছু না। নিরম্বু উপবাস। রাত্রে সত্যনারায়নের পূজো হবে।

—আজ তো পূন্নিমে নয়।

—না। আজ সংক্রান্তি।

রমা নিরাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাল। অস্ফুটকণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো: কাল একাদশী।

শুক্তি বললে, কাল থেকে তিনদিন বাড়িতে ভগবৎ পাঠ হবে। পাড়ার মেয়েদের সব পাঠ শুনতে আসতে বলিস।

পূজোর দালানে ঠাকুর এসে পূজোয় বসেছে। বাড়ির লোকজন, পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সব জমা হয়েছে সত্যনারায়নের কথা শুনতে! ছেলেমেয়েরা ভিড় করে বসেছে প্রসাদ পাবার লোভে।

শুক্তি এদিক-ওদিক চেয়ে রমাকে ডেকে বললে, নিমু আর নিমুর মাষ্টারকে দেখছিনা যে? এখনো গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরেনি নাকি?

সন্ধ্যার আগে শুক্তি গিয়েছিল গঙ্গায় চান করতে। গঙ্গার ধারে তাদের দুজনকে দেখে এসেছিল।

নিমু এসে দালানে উঠল।

রমা জিজ্ঞেস করলে, মাষ্টার কোথায়?

নিমু মায়ের মুখপানে চেয়ে বললে, ঘরে। আমি ডাকলুম। এলোনা। বললে, বড্ড মাথা ধরেছে।

বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে শুক্তি রমার পানে চেয়ে বললে, ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নেই বলেই এই দুর্গতি। তুই যা, আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়।

অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে কল্যাণ দালানের একপাশে এসে বসলো। শুক্তি দূর থেকে একবার তারপানে চেয়ে দেখল।

কল্যাণ সারাদিন আজ শুক্তিকে দেখেনি। দেখা দিতে তার সাহসে কুলোয়নি। সে-ই নিজে থেকে তাকে ডেকে পাঠাল তাই সে আসতে পারল। এই-ডাকটা কল্যাণের কাছে একটা আশ্চর্য। শুক্তিকে দেখে শুধু তার চোখ জুড়ালো না তার মনের চেহারা বদলে গেল। তার অন্তরজোড়া দাবদাহ নিভে গেল। সারাদিনটা তার একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে কেটেছে। একটা দুঃসহ অন্তর্জ্বালা তাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। ব্যর্থতার ভারে সে ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু এখানে এসেই কল্যাণের মনে হলো শুক্তি যেন তার মনোভাব বুঝতে পেরে তার মনের আগুন নিবিয়ে দেবার জন্যই তাকে ডেকে পাঠাল।

শুক্তির পানে চেয়ে তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। ভুলে গেল সে নিজের কথা। ভুলে গেল সে জগৎ সংসার। মনে বৈরাগ্যের ছোঁয়া লাগল।

এ তপস্যার রূপ। তপোপ্রভাবের জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য। কে বলবে ও বিধবা? ও অনাহত কুমারী। ও অনূঢ়া ঋষিকন্যা। ও তপস্বিনী উমা।

ওর মুখের দিকে চাইতে কল্যাণের লজ্জা করে। ভয় হয়।

কী নিশ্চিন্ত আর আত্মগত!

কতো ভক্তি আর কতো বিশ্বাস!

আরো কত মেয়ে সেখানে এসেছে। তাদের মাঝে শুক্তিকে খুঁজে পায়না কল্যাণ।

পরনে সাদা গরদের শাড়ি। একমাথা এলোচুল। পিঠের উপর অবিন্যস্ত। গলার আঁচলের ফাঁকে সরু একটু চিকচিকে হার। হাতে

গুগাছি করে সোনার চুরি। বাঁ হাতের বাজুতে মোটা সোনার কবচ। দেহ যেন রজনীগন্ধার দণ্ড। হাওয়ায় দুলছে। মুখে দেবীভাব। চোখে উদাস তন্ময়তা।

সারাদিন উপবাসী। বিগত রাত্রির অনিদ্রা ও উত্তেজনা। অথচ শান্ত মুখে কী স্নিগ্ধ কমনীয়তা। আয়ত লোচনে কী অনাবিল স্বচ্ছতা। ক্লান্তির ক্ষীণ ছায়াটুকু নেই।

অদ্ভুত মনে হয় কল্যাণের।

পূজা-পাঠ শেষ হলে শুক্তি নিমুকে ডাকল, উঠে এসে শান্তি-জল নিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে যাও। মাষ্টার মশায়কে আসতে বল।

কল্যাণ একবার মুখ তুলে শুক্তির পানে তাকাল। তার মুখের প্রশান্ত গাম্ভীর্যে সে অবাক হয়ে গেল। দ্বিরুক্তি না করে নিঃশব্দে সে নিমুর হাত ধরে এগিয়ে এলো। নত হয়ে মাটিতে বসলো। মাথায় শান্তিজল নিয়ে আভূমি প্রণত হলো পিতা-পুত্রে।

শুক্তির চোখদুটি চিক-চিক করে উঠল। তার শুচিস্মিত মুখে তপস্যালব্ধ ভক্তি ও বিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠলো।

আর কল্যাণ সেই দেবালয়ের পবিত্র প্রতিবেশে কোন অদৃশ্য দেবতার প্রসন্ন ও কল্যাণ করস্পর্শ অনুভব করলো তার তাপদগ্ধ ললাটে। উদ্বেল হৃদয়ের ভাবাবেগে তার চোখ দুটি সজল হয়ে এলো।

তিনদিন বাড়িতে পাঠ হলো। তিনদিন প্রভাত হতে পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুক্তি নিরম্বু উপবাস করে রইলো। বাড়ির পরিজনেরা অবাক হয়ে গেল। কল্যাণ ভয় পেল। আর কেউ না জানুক তার বুঝতে বাকি রইলো না কিসের এই কৃচ্ছ্র-সাধন। কিসের এই প্রায়োপবেশন!

শুক্তি কি আত্মঘাতী হবে নাকি?

আত্মশুদ্ধির জন্য আত্ম-অপচয় করবে নাকি?

কল্যাণ মনের মাঝে ছটফট করতে থাকে। অথচ কোন কিছু

করতে পারে না। শুক্তি এখন তার কাছে একান্ত অনধিগম্য। দুর্গম। সন্ধ্যার পর পূজার দালানে পাঠের আসরে তার দেখা পায়। তখন সে অন্য জগতে। মন তার পৃথিবীর ও-পারে।

ইচ্ছা না থাকলেও কল্যাণকে পাঠের আসরে গিয়ে বসতে হয়। শুক্তির আদেশ।

সে শুক্তির পানে চেয়ে চেয়ে দেখে। শুক্তি যেন জ্বলে উঠেছে, পবিত্র দেব বেদীর অনির্বাণ দীপশিখার মত। তার জীবন রাগিণী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। সে যেন দেবাদিষ্ট দেবদাসীর মত দেবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। সে জেগে উঠেছে। ভরে উঠেছে। তৃপ্তির ভরা জোয়ারে থমথম করছে। কোন কিছুর তাড়না নেই। কোন কিছুর অভাব নেই। তার আত্মবিলুপ্তি ঘটেছে।

কী পেল সে? কী পেয়ে তার মনের দুকূল ভরে উঠল? ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলল? কামনা-বাসনাকে তুচ্ছ করল?

কিসের ঠেসে, কিসের উপর সে অমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কল্যাণ তাকে বুঝতে পারে না। জটিল আধ্যাত্ম জীবনে তার বিশ্বাস নেই। আস্থা নেই।

শুক্তি ঢেউ কাটিয়ে শক্ত মাটিতে পা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল। সে সহজ হয়ে মনকে গুছিয়ে আবার জীবনের আঙিনায় এসেছিল। কাশী যাত্রার আয়োজন করছিল। একগুঁয়ে নিমু কিন্তু তাকে বিব্রত করে তুলল। কল্যাণকে ছেড়ে সে কিছুতে যেতে চায় না। মাষ্টারকে তার সঙ্গে যেতে হবে। 'আমরা যাবো—মাষ্টার যাবে না কেন?' জেদী, একরোখা ছেলে কিছুতেই মাথা নোয়াবে না। মায়ের কাছে তম্বি করে। কল্যাণকে কাকুতি করে। চোখের জল ফেলে।

কল্যাণ যে কী বলবে, কী বলে তাকে বোঝাবে ভেবে পায় না।

নিজেকে তার অত্যন্ত অসহায় মনে হয়। নিজের মনের পানে চেয়ে সে শিউরে ওঠে। মিমু তার অস্থিপঞ্জরে বাসা বেঁধেছে।

সত্যিই কী এখান থেকে সে যেতে চায়? নিমুকে ছেড়ে, শুক্তিকে চোখের আড়াল করে সে কোন তুস্তরে পাড়ি দেবে?

তার অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে। তার শ্বাসরোধ হয়ে আসে।

আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় তার হৃৎপিণ্ড মুচড়ে ওঠে। শুক্তিকে গিয়ে তার বলতে ইচ্ছা করে,—আমায় এখান থেকে নির্বাসিত করো না। আমি নিমুকে ছেড়ে যেতে পারবোনা। নিমু আমাকে ছেড়ে বাঁচবে না। আমাকে এখানে থাকতে দাও। নিমুকে গড়ে তোলবার অধিকার আমায় দাও।

কিন্তু না। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নিমুকে চোখের আড়াল করে সে এখান থেকে বিদায় নেবে। চিরদিনের মত। সে প্রতিশ্রুতি তাকে পালন করতে হবে। অক্ষবে অক্ষরে। নিজের কথা সে কোন-দিন ভাবেনি। এখনো ভাববে না। এখান থেকে তাকে যেতে হবে শুক্তির সম্মান ও সুনাম অক্ষত রাখবার জন্য। নিমুর মুখ চাইলে চলবে না। শুক্তির অন্তরের দিকে চেয়ে তাকে কঠিন হয়ে সব ভুলতে হবে। সব সইতে হবে।

নিমুর শিশুমনের দাগ মুছতে দেরী লাগবে না।

শুক্তিরও সেই ধারণা। শিশুমনের দাগ জলের দাগ। দু-চার দিন বড়ো জোর মন খাবাপ কবে থাকবে। উপায় কী? সব ঠিক হয়ে গেছে। টিকিট কেনা, বার্থ রিজার্ভ কবা পর্যন্ত হয়ে গেছে।

শুক্তি কল্যাণকে বললে, আমরা পরশু রাত্রে যাচ্ছি। তুমি কিছু ঠিক করলে?

কল্যাণ বললে, তোমরা চলে গেলেই আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—তা জানি। কিন্তু যাবে কোথায়, কী করবে তার কোন ব্যবস্থা করলে?

শুক্তি প্রশ্ন করল।

কল্যাণ মুহূর্ত তারপানে চেয়ে মাথা হেঁট করে বললে, না। এখনো কিছু ঠিক করিনি।

—বেশ। ঠিক করে, তবে এখান থেকে যেয়ো। ব্যবস্থা যতোদিন না হয় ততোদিন এখানে থাকবে। যেমন ছিলে। যাবার কথা তো আর কেউ জানে না।

—না। কেউ জানবে না।

শুক্তিকে আশ্বাস দেবার জন্যই যেন তার অস্ফুট কণ্ঠ ধ্বনিত হলো।

শুক্তি ঘর থেকে যাবার সময় আবার বললে, নিজের সব ব্যবস্থা না করে যেয়ো না। আমি তোমায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছি না।

কল্যাণের মনে হলো শুক্তির কণ্ঠের সুর বদলে গেছে। তার মনের ছন্দ বদলে গেছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে ঘিরে আছে, লোহার বর্মের মত। শুক্তিকে বোঝবার যোগ্যতা কল্যাণের নেই।

কল্যাণও নিজেকে শক্ত করে তুলতে চায়। কিন্তু শুক্তি যা পারে কল্যাণ তা পারে না কেন?

আধেক রাতে শুক্তির ঘুম ভেঙ্গে যায়।

নিমু!

আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি। নিমু বিছানায় নেই।

নিমু! নিমু!

আলো জ্বালে শুক্তি। কিন্তু নিমু কই? ঘরে নিমু নেই। ঘরের দরজা খোলা।

কোথায় গেল নিমু?

অনেক বুঝিয়ে, অনেক চোখের জল মুছিয়ে, অনেক লোভ দেখিয়ে রাত্রে তাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। ঘুমের মধ্যেও সে বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। চাপা কান্নার আবেগে সারা দেহটা ফুলে ফুলে উঠেছে। শুক্তি তাকে বুকে চেপে ধরেছে। তাকে সামলাতে গিয়ে নিজে ভেঙ্গে

পড়েছে। তার চোখের জল মোছাতে গিয়ে নিজের চোখ ছাপিয়ে জল এসেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা ডিঙ্গিয়ে সে কল্যাণের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে ঘরে।

শুক্তি নিঃশব্দে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কল্যাণের বুকের উপর আছড়ে পড়ে নিমু ফুলে ফুলে কাঁদছে। সমবয়সী সাথির মত কল্যাণ কাঁদতে কাঁদতে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

মুহূর্তে শুক্তির চোখের সামনে তাদের আসক্তির আসল রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার চোখ জ্বালা করে এলো, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো কিন্তু চোখে তার জল এলো না। হিংসাব আগুন ঠিকরে পড়ল। নিমুকে ঘিরে তার জীবনেব আশা-আকাঙ্ক্ষা, এই দীর্ঘ দিন ধরে দিনে দিনে তিলে তিলে গড়া হৃদয়-সৌধ নিমেষে তার চোখের সামনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। দাবি তো তার অধিকারের নয়। তার হৃদয়ের। অধিকার তাকে তার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। হৃদয় দিয়েও সে অধিকারের দাবিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। সব মিছে হয়ে গেল। ভস্মে ঘি ঢালা হলো। সব বিকৃত, বিস্বাদ ও আনন্দহীন মনে হলো।

শুক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। অবাধ্য সন্তানের অনমনীয় স্পর্দ্ধায় সে রাগে অন্ধ হয়ে গেল। সে সজোরে ও সশব্দে দরজাটা ঠেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

নিমু আর কল্যাণ দুজনেই চমকে উঠল শুক্তির মূর্তি দেখে।

ভয়ার্ত কম্পিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত চোখ তুলেই মাথা হেঁট করল নিমু।

কল্যাণ তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

শুক্তি দাঁতে ঠোঁট চেপে কম্পিত বিদ্রূপের কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কী পরামর্শ হলো দুজনে? কী ঠিক হলো?

কল্যাণ কোন কিছু বলবার আগেই নিমু চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গিয়ে

মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আর কাঁদবো না। সেই কথাই মাষ্টারমশায়কে বলতে এসেছিলুম।

জলভরা চিকচিকে চোখে সে মায়ের মুখপানে তাকাল। শুক্তি মাথা নিচু করে আনত মুখে তার চোখে চোখ রেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার আরক্ত মুখখানা এমনি ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো মনে হলো যেন তার উদ্যত বেতটা তারই পিঠে পড়েছে। কিছুক্ষণ এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সে ঝপ করে নিমুকে বুকে তুলে নিয়ে বলে উঠলো, তুমি শত্রু, আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করবে।

অদ্ভুত কোমল এবং কঠোর তার কণ্ঠস্বর। গায়ে রোমাঞ্চ জাগে।

সে নিমুকে বুকে ফেলে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল, কল্যাণ দৃপ্তস্বরে বললে, পারে তো ও-ই তোমার জীবনকে গৌরবময় ও মধুময় করে তুলবে।

শুক্তি মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। বলতে চাইল, তোমার শুভেচ্ছা ওর জীবনে সত্য হোক। কিন্তু সে বলতে পারল না। একটি অপরূপ অপাঙ্গ-দৃষ্টি হেনে ধীর পায়ে চলে গেল।

সকালে শুক্তি কল্যাণকে ডেকে পাঠাল। ডেকে পাঠালো রমার মারফতে।

রমাকে ডেকে আনতে বললে সে বেঁধে নিয়ে আসে। সে কল্যাণকে সঙ্গে করে শুক্তির ঘরে পৌঁছে দিয়ে বললে, মাষ্টার এসেছে বৌদি!

শুক্তি বাইরের ঘরে নিমুকে জামা কাপড় পরিয়ে দিচ্ছিল। একটি শুভ্র হাসি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করে মধুর কণ্ঠে বললে, বসো।

নিমু অধৈর্যের মত নাচতে নাচতে বলে উঠলো, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে মাষ্টারমশাই। মা বলেছে।

কল্যাণের মুখখানা গাম্ভীর্যে কালো হয়ে উঠলো। শুক্তি লক্ষ্য করলে।

নিমু বললে, যাবে তো? সরকারবাবু টিকিট করতে যাচ্ছে।

শুক্তি মৃদু হেসে বললে, আনন্দ দেখেচো নিমুর। আনন্দ উথলে উঠছে। তুমি না গেলে তো ও ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়বে।

কল্যাণ অস্থির একটা অঙ্গভঙ্গি করে বলে উঠলো, কিন্তু আমি যাবো কেমন করে ?

রমা একপাশে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠলো, কেন ট্রেণে করে। সবাই যেমন করে যাবে। ঢং।

শুক্তি হেসে উঠলো।

কল্যাণ মাথা হেঁট করল।

শুক্তি রমাকে জিজ্ঞেস করলে, মাষ্টারকে তো এখনো চা দিসনি ?

—না। এইখানে নিয়ে আসছি।

রমা কল্যাণের পানে একটা তীর্যক কটাক্ষ হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শুক্তি মুখটিপে হাসতে হাসতে বললে, যেতে হবে নিরুপায় হয়ে। আর এর জন্যে সত্যিকার দায়ি তো তুমিই। ছেলেকে তুমি যাদু করেছো। তোমাকেই তাল সামলাতে হবে।

কল্যাণ নিমুকে কাছে টেনে নিয়ে আদরের মিহিস্বুরে বললে, আমার যাওয়া হবে না নিমু—

ঝাঁকানি দিয়ে নিমু বলে উঠলো, আলবৎ হবে। মা যখন বলেছে।

শুক্তি আরক্ত মুখে গম্ভীর হয়ে বললে, এখন তো চলো। তারপর একটা বেবস্থা করলেই হবে। ছেলেকে আর কত কাঁদাবে ?

শুক্তির গলার স্বরটা মোলায়েম হলেও ভঙ্গিটা প্রায় আদেশের মত। কল্যাণ যার কাছে একান্ত দুর্বল ও অসহায়।

চা নিয়ে রমা ঘরে ঢুকলো। কল্যাণের সামনে টি-পয়ের উপর চায়ের পেয়ালাটা রেখে উর্ধ্বশ্বাসে প্রশ্ন করল, মাষ্টারের যাওয়া ঠিক হলো ?

নিমু উল্লাসের কণ্ঠে জবাব দিল, হলো হলো।

শুক্তি অপাঙ্গে কল্যাণের পানে চেয়ে বললে, একা নিমু হাঁপ ছাড়লে না। আর একটা অবলা প্রাণীর ধড়ে প্রাণ এলো।

রমা মধুর সলজ্জ ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বললে, তা এলো।

কল্যাণ মিটমিট করে রমার পানে চাইলো। শুক্তি হেসে উঠলো।

শুক্তির প্রাণখোলা হাসির তোড়ে কল্যাণের গা সিরসির করে। দিনেব সূচনাটা আজ তার আনন্দময় মনে হলো। পথের শেষে যা-ই থাক।

প্রসন্নময়ী শুক্তিব বরদা রূপ দেখে কল্যাণ অন্তর্যামীর চরণে মনে মনে প্রণাম কবল।

॥ এগারো ॥

কেদার ঘাটের এ-দিকটায় ভিড় নেই।

ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল তুজনে।

কল্যাণ আর শুক্তি।

জনবিরল ঘাটের একটা সিঁড়ির কোণে এসে শুক্তি কল্যাণকে বললে, এইখানে আমরা বসতে পারি। এ-দিকে কেউ আসবে না।

অভিভূতের মত কল্যাণ তার মুখের পানে চেয়ে বললে, না আসতেও পারে। আসতেও কারুর নিষেধ তো নেই।

কল্যাণের কণ্ঠে উর্ধ্বশ্বাস উৎকণ্ঠা।

শুক্তি ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, কেউ এসে আমাদের তুজনকে নিরালায় একত্র দেখলে মনে ভাববে একজোড়া প্রণয়ী। এই না ভাবছো তুমি ?

কল্যাণ দ্বিধাজড়িত স্বরে বললে, ভাবা তো অস্বাভাবিক নয়।

—স্বাভাবিকও নয়। মেয়েপুরুষের তুনিয়ায় ও-ছাড়া আরো অনেক পবিত্র স্নেহের সম্পর্ক আছে। বসো না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

সম্ভ্রমের দূরত্ব বাঁচিয়ে কল্যাণ তার সামনে বসল।

শুক্তি মৃত্নু হেসে বললে, তোমাকে সারপ্রাইজ করে দিয়েছি, না ? কিন্তু আরো বড়ো সারপ্রাইজের জন্যে তৈরি হও। আগে তোমাকে একটা ইনটারেষ্টিং গল্প বলি শোন।

সত্যিই কল্যাণ অবাক হয়ে গেছে শুক্তির অদ্ভুত আচরণে। ঘর থেকে চুপি চুপি একা তাকে ডেকে এনে এই নির্জনতার নিরিবিলিতে কী কথা সে শোনাতে চায় ?

কল্যাণ সংশয় বিচলিত মনে দূর আকাশের পানে চাইল। সন্ধ্যার ধূম্র-ধূসরতা কেটে গেছে। মাথার উপর নির্মল আকাশে শুক্লপক্ষের

ত্রয়োদশীর চাঁদ। চাঁদের আলোয় স্বচ্ছ আকাশের বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। চাঁদের আলোয় গঙ্গার তরঙ্গগুলো মাথা উঁচু করে সাপের ফণার মত নাচছে। ঘাটের মাথার সারি সারি আলোগুলোও মালার মত তরঙ্গের সঙ্গে দুলছে। চাঁদের আলোয় শুক্তির শুভ্র মুখখানা শ্বেতপদ্মের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার চোখদুটি চিকচিক করছে। তার কম্পিত ঠোঁটে একটি স্নিগ্ধ হাসি। তার সমস্ত শরীর জুড়ে অকম্প আত্মবিশ্বাসের দীপ্র আলো।

কল্যাণ উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাস। সে ঘেমে উঠলো শুক্তির ঘন সান্নিধ্যের নিবিড়তায়।

শুক্তি শান্তকণ্ঠে বিশদভাবে একে একে বিবৃত করল মেটারনিটিতে নিমুর জন্মবৃত্তান্ত। ধারার অসহায়তা। মৃতবৎসা শুক্তিকে ধারার সদ্য-প্রসূত সন্তান দান। একটু থেমে দম নিয়ে শুক্তি বললে, এ রূপকথা নয়। কাহিনী নয়। এ নিরেট নিটোল সত্য। ক্ষুধা দারিদ্র্য ও দুর্গতির পীড়নে মা সন্তানকে বিলিয়ে দিয়েছিল। নিমু তোমার ও ধারার সেই সন্তান। আমার বক্ষরসে পুষ্ট। আমার রক্তক্ষরা স্নেহে লালিত। মিথ্যাকে সত্যের রাজবেশ পরিয়ে আমার স্বামীর সংসারে প্রতিষ্ঠা করেছি। স্বামীর উত্তর-সাধক বলে ওর পরিচয় দিয়েছি। আমি, ধারা আর সেই নার্শ, এই তিনটি প্রাণী ছাড়া ত্রিসংসারে আর কেউ এ কথা জানে না। এই গোপনতা ধারার সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল। সেই সূত্রেই ধারা আমার বাড়িতে যাতায়াত করতো। সে আসতো নিমুকে দেখতে।

কল্যাণ স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

নিমু তার আর ধারার সন্তান। শুক্তির কেউ নয়?

এ যে আবিশ্বাস্য। অচিন্ত্যনীয়। অসহ্য বিস্ময়।

নিমু তার সন্তান। তার দেহের একটা টুকরো। তারই রক্তের গান।...ভাবতে পারে না কল্যাণ। সব ঘুলিয়ে যায়।

প্রকৃতির নিয়মে এরি নাম কি প্রতিক্রিয়া?

কুহকাচ্ছন্ন নির্জীবের মত কল্যাণ শুক্তির মুখের পানে চেয়ে বসে রইলো, একটি কথাও বললে না। শুক্তিও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তার পানে চেয়ে রইলো।

মাঝ-গঙ্গায় নৌকোর বুকে ভাটিয়ালি সুরে কে গান ধরেছে। ঘাটের মাথা দিয়ে কথা বলতে বলতে দু' একটি নরনারী আনাগোনা করছে। কিন্তু কিছুই তাদের চেতনাকে স্পর্শ করছে না। তারা তাদের অতীতে ফিরে গেছে।

শুক্তি বললে, তোমার পরিচয় পেয়ে আমি চমকে গেলুম। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো বিস্ময় আমার বাড়িতে তোমার আবির্ভাব। কে তোমাকে হাত ধরে নিমুর কাছে এনে দিল? কে তার কল্যাণের তাকে মানুষ করবার দায়-দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে তুলে দিল?

কল্যাণ শুক্তির উত্তেজনারক্ত মুখের পানে তাকাল। মুখে তাব কথা নেই। দৃষ্টি তাঁর মুখর।

শুক্তি বলে উঠলো, আমি? না, আমি নই। আমি নিমিত্ত। ইচ্ছা তাঁর। দৈবের পরিকল্পনা। নিয়তির অমোঘ বিধান। সংসারে যাকে নিয়ে এলে, সৃষ্টি করলে যাকে, তাকে চিনবে না? চোখ ভরে দেখবে না নিজের সৃষ্টিকে?

কল্যাণ মাথা হেঁট করলে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে।

শুক্তি বললে, তুমি চিনলে না নিজের সন্তানকে, অবোধ সন্তান চিনলো তার নিরুদ্দিষ্ট পিতাকে। চিনলো তোমাদের রক্ত কাছাকাছি হতেই। আমি ভয় পেলুম তোমাদের অসাধারণ আসক্তি দেখে, পুলকিত হলুম অন্তরের গভীরে। নিমুই আমাকে হাতধরে তোমার দিকে এগিয়ে দিল। তোমার অধিগম্য করে দিল। নিমুর পিতাকে আমি আপনজন ভাবলুম। তারপর ধারা যখন তোমার জীবন থেকে অন্তর্হিত হলো, তখন থেকে এই সত্যটা তোমার কাছে প্রকাশ করবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। কিন্তু বলতে পারি নেই

নিজের মনে একটা কুণ্ঠা, একটা সঙ্কোচ ছিল বলে। নিমুর বাবার পাশে নিমুর মা সেজে দাঁড়াতে আমার সংস্কার কুণ্ঠিত হতো। বৈধব্য বিব্রত হতো।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল কল্যাণ। এখন কি তুমি নিমুকে প্রত্যর্পণ করতে চাও?

শুক্তি অন্তরে শিউরে উঠলো। কিন্তু মুখে বলল, তুমি নিমুকে ফিবে চাইলে দিতেই হবে। কিন্তু তুমি কী ওকে নিয়ে গিয়ে বাঁচাতে পাবেবে?

—আমি? এ পবিচয় নিমুকে দিও না শুক্তি দেবী। এ পরিচয় তাব জীবনদেবতাব আশীর্বাদ নয়। অভিশাপ। যে পরিচয় সে জানে সেই পবিচয়েব আলো-বাতাসে তাকে বাঁচতে দাও। তাকে মানুষ হতে দাও।

শুক্তি স্মিতমুখে কল্যাণেব পানে চাইল। তাব চোখদুটি প্রোজ্জল হয়ে উঠল।

কল্যাণ উচ্ছসিত কণ্ঠে বললে, স্বর্গত সমব মুখুজ্জে ওর পিতা—শুক্তি দেবী মাতা এই নিমুব জন্মপবিচয। এ গৌরবময় পবিচিতি থেকে তাকে তুমি বঞ্চিত করবে কেন? তাছাড়া তোমাকে বাদ দিয়ে ওর শিশুজীবনের কোন ব্যাখা আছে নাকি?

শুক্তি মৃদু হেসে বললে, ছিল না তোমাকে দেখবার আগে।

কল্যাণ বললে, অর্থাৎ তুমি আমাব স্নেহকে হিংসেব চোখে দেখো।

—তা হয়তো দেখি। সব মা-ই দেখে। মায়ের চেয়ে ছেলেকে কেউ বেশী ভালবাসে, কোন মা-ই সেটা বরদাস্ত কবতে পারে না। শুধু হিংসে কেন, আমি ভয়ও কবি। কাবণ আমাব সত্যিকার কোন অধিকাব তো নেই ওব ওপব।

কল্যাণ বললে, ও তোমাব মনের দৈন্য। হৃদয়ের অধিকাব, অধিকার নয়? জন্মের পর থেকে তোমার হৃদয়ের নিচে যার বাসস্থান তার অধিকার নেই তোমার ওপর?

শুক্তি বললে, সে অধিকার ধর্মবিহিত নয়। আইন সম্মত নয়। আমার শ্বশুরকুলের প্রতিনিধি হয়ে বংশের পূর্বপুরুষকে জলদান করবার অধিকার কোথায় তার? আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মিক মঙ্গল অনুষ্ঠান করবার অধিকার কোথা তার? মনের আগোচর মিথ্যা নেই। কেউ না জানুক তবু জেনে শুনে আমি ওর পরিচয়কে একটা মিথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যাবো কেন? আমার স্বর্গত স্বামী ও শ্বশুরকুলেব সঙ্গে একটা হীন প্রবঞ্চনা করা হবে।

—তা হলে কী করবে?

উৎসুক দৃষ্টি তুলে কল্যাণ প্রশ্ন করল।

শুক্তি কম্পিত চোখদুটি তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললে, তুমি ওর পিতা, ওকে তুমি আমায় দান করো যথাবিহিত শাস্ত্রসম্মত বিধিতে। আমি ওকে গ্রহণ করি পোষ্য পুত্র রূপে। বিবিসম্মত যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তুমি আমাকে ওর মাতৃত্বে উত্তীর্ণ করে দাও। আমার স্বামীর ও শ্বশুর কুলের উত্তরপুরুষ রূপে ওকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করে দাও।

কল্যাণ হাসল : সে তো একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপাব।

—যে পুণ্যময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এক সংসারের কন্যা আরেক সংসারের বধূরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক তেমনি এক ভাবগম্ভীর যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এক সংসারের পুত্র গোত্রান্তরিত হয়ে এক নতুন সংসারের আত্মজ বলে গণ্য হবে।

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল কল্যাণ তারপর হঠাৎ মাথা তুলে বললে, তথাস্তু। নিমুর কাছে···আমাদের পরিচয় কিন্তু চিরদিন গোপন রাখবে।

ফেরবার পথে কল্যাণ বললে, তারপর আমাকে ছুটি দেবে তো?

মুখ ঘুরিয়ে শুক্তি বললে, কেন, নিস্বত্ব হয়ে নিমুকে দান করে নিমুব সংসারে থাকতে বুঝি আপত্তি হবে?

কল্যাণ মাথা নিচু করে বললে, আপত্তি না হলেও, উচিত নয়।

শুক্তি নিঃশব্দে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চাইল। কী দেখল সেই জানে। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, উচিত অনুচিতের কথা ভাববার এখন সময় নয়। আগে শুদ্ধান্তকরণে আমার কাজ উদ্ধার করে দাও। এ এক মহাপুণ্য অনুষ্ঠান।

শুক্তির মন থেকে ভার নেমে গেছে। অনিশ্চিতের ভার। অনিশ্চিতের আবছা অন্ধকার থেকে সে সুনিশ্চিত সত্যের আলোকে অবগাহন করেছে। আর তার মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। নিরর্থক নয় তার মাতৃত্ব। পরিচয় নয় তার ধূসর ও অস্পষ্ট। বিবর্ণ ও বিবাদী নয় তার অধিকার। তার মাতৃত্বের আখ্যা। নিমুকে সে তার শ্বশুরকুলের পারিবারিক মর্যাদা দিয়েছে বিধিমতে। শাস্ত্রমতে। নিমু তার সগোত্র। তার বংশধর। স্বামীর কাছে শ্বশুরকুলের কাছে সে নিরপরাধ, নিরপেক্ষ।

নিমু সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত। নিরুদ্বেগ।

তার মনের আকাশ ভাবমুক্ত প্রভাত আকাশের মতই স্বচ্ছ ও সুনীল। মাতৃত্বের পরিপূর্ণ গৌরবে ভরা মন নিয়ে সে সত্যেব শুভ্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশ্বের প্রতি মন তার দাক্ষিণ্যে উদ্বেল। করুণায় আর্দ্র। চারিদিকে উৎসারিত হচ্ছে তার চিত্তের পূর্ণতা প্রভাত রৌদ্রের মত। নিজের পরিপূর্ণতা দিয়ে সে সকলের শূন্যতা ঘোচাতে চায়। তার চলাফেরায়, কথাবর্তায়, সকল কাজের মধ্যে দিয়েই যেন দয়া দাক্ষিণ্যের অবিরাম ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। মেয়েরা বলাবলি করে কাশীর অন্নপূর্ণা ও-কে ভর করেছে।

কঠিন দুঃখে ভেজা ওর জীবন। বুকের রক্তক্ষরা ওর ভালবাসা। অন্ধকারে যার দিনের সূচনা গলে যাবে না সে সূর্যের প্রখর প্রকাশে। সেই আলোর বন্যায় সে গলে যাচ্ছে। সেই আলো সে বিকীর্ণ করছে

পরের বিড়ম্বিত জীবনে। সবার উপর একটা সাদর অনুরাগ। একটা সার্বজনীন প্রীতি!

কল্যাণ তার পানে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে সে দূর অন্তরাল থেকে। কাছের মানুষকে দূর থেকে দেখার অভিনবত্ব আছে। একটা নতুন দিগন্তের আভাষ পাওয়া যায়। কাছের মানুষের ছবি দেখার মত। পোষা পায়রাকে আকাশে উড়িয়ে দেখাব মত। দেওয়ালের গায়ে নিজের ছায়া দেখার মত। দূরের মায়া রচনার মাঝে মাধুর্য আছে। রোমাঞ্চ আছে।

কল্যাণ তাকে দূর থেকে দেখে একটা নতুন ধরণের তৃপ্তি অনুভব করে। দেখে তার মুখের প্রতিটি রেখায় আনন্দের উল্লাস। তার সর্বাঙ্গে আত্মপ্রসাদের শুভ্রতা। তার দীপ্র চোখদুটিতে বাৎসল্যের বন্যা।

কল্যাণের মনে হয় তার মাতৃত্ব তার অতীতের আর সব পরিচয়কে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সন্তানের চিন্তা তার জীবনের আর সব উপলব্ধিকে অসাড় করে দিয়েছে। তাকে অতীন্দ্রিয় কবে তুলেছে। মা ছাড়া তার অন্য কোন পরিচয় নেই। তার অন্যরূপ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তার অতীত দিগন্তে কী ছিল কে জানে! সে যেন মা হয়েই জন্মেছিল। কৈশোর ও যৌবনের উন্মেষে সে কেমনটি ছিল, কেমন ছিল তার সাকাঙ্ক্ষ প্রিয়ার ভাবরূপ, কেমন ছিল তার সাভরণা সীমন্তিনী মূর্তি। কেমন ছিল তার স্বল্পায়ু ও সঙ্ক্ষিপ্ত প্রেমেব ব্যঞ্জনা? কোমল পত্রপুঞ্জ কেমন করে আন্দোলিত হলো, ঝড়ের দাপটে কবে সে অন্ধ ও অচেতন হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল মরণোন্মুখের সেবায়। নিজের জীবনের সতেজ রক্ত দিয়ে মুমূর্ষুর জীবনকে প্রাণবন্ত করে তুলল। মরণকে তার মধুময় করে দিল।…

কল্যাণ ভাবে আর দেখে। দেখে আর ভাবে।

কান্না নয়। দূরাগত ব্যথার গান। মঞ্চের বুকে বিয়োগান্ত একাঙ্কিকা।

কল্যাণ, কঠোর কল্যাণ ভাবুক হয়ে উঠল। পাষাণের বুক ফেটে জল বেরুল। উদ্ধত নির্মম দস্যু কবি বনে গেল।

শুক্তির সান্নিধ্যকে সে ভয় করে। তার শ্রদ্ধা সঙ্কুচিত হয়। পাছে তার স্বপ্নের শুচিতায় বাস্তবের অশুচি লাগে। তার গানের সুর কেটে যায়।

তাই সে দূরের আড়াল দিয়ে তাকে দেখে। অবাধ অগাধ চোখে তাকে দেখে।

নিমুকে সে তাকে দান করেছে। শুক্তির অন্তর তাই কল্যাণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সজল। দুজনে দেখা হলে এমনি আচ্ছন্নের মত সে তাবপানে তাকায় আর এমনি অদ্ভুত একটি হাসি তার অধরে ভেসে ওঠে যে কল্যাণ তার কোন মানে খুঁজে পায় না। তার বুকের নিচেটা থরথর কবে কেঁপে ওঠে। সে মুখ তুলে তারপানে চাইতে পাবে না। অথচ সে হাসিতে নেই তারুণ্যেব মদিরতা। নেই কোন অদৃশ্য অঙ্গীভূত প্রতিশ্রুতি। নেই কোন অন্তরস্থ আসক্তি। নেই কোন ভাবাবেগেব প্রশ্রয়।

কল্যাণ মুগ্ধ শ্রদ্ধালু দৃষ্টি দিয়ে দূব থেকে তাকে দেখে। আর ভাবে।

নিজের অস্থির ভাবাবেগে সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। যুক্তি জ্ঞানহীন অবাধ্য হৃদয় তার অজানা ব্যথায় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অথচ নিজেই বুঝতে পারে না কিসের এই দুঃসহ ব্যথা? কিসের এই বুকফাটা হাহাকার!

মন তাব ছুটে পালাতে চায় কোন নিরুদ্দেশের পথে। এখানে আর সে ক্ষণকাল তিষ্ঠতে পারছে না।

নিজেকে তার ভয় হয়। নিজের উপর বিশ্বাস হারায়। মনে হয় নিমুব সম্পর্ক তাদের দুজনকে একটা অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধছে। পারাপারের সেতুর মত নিমু তাদের দুর্গম পথকে সুগম করে দিচ্ছে। অসম্ভাব্যকে সম্ভব করে তুলছে। নিমুর সত্য পরিচয়, তার অপ্রকাশ্য জন্মবার্তা দুজনেরই মনের আকাশকে মেঘমেদুর করে তুলছে।

পরের বিড়ম্বিত জীবনে। সবার উপর একটা সাদর অনুরাগ। একটা সার্বজনীন প্রীতি।

কল্যাণ তার পানে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে সে দূর অন্তরাল থেকে। কাছের মানুষকে দূর থেকে দেখার অভিনবত্ব আছে। একটা নতুন দিগন্তের আভাষ পাওয়া যায়। কাছের মানুষের ছবি দেখার মত। পোষা পায়রাকে আকাশে উড়িয়ে দেখার মত। দেওয়ালের গায়ে নিজের ছায়া দেখার মত। দূরের মায়া রচনার মাঝে মাধুর্য আছে। রোমাঞ্চ আছে।

কল্যাণ তাকে দূর থেকে দেখে একটা নতুন ধরণের তৃপ্তি অনুভব করে। দেখে তার মুখের প্রতিটি রেখায় আনন্দের উল্লাস। তার সর্বাঙ্গে আত্মপ্রসাদের শুভ্রতা। তার দীপ্র চোখদুটিতে বাৎসল্যের বন্যা।

কল্যাণের মনে হয় তার মাতৃত্ব তার অতীতের আর সব পরিচয়কে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সন্তানের চিন্তা তার জীবনের আর সব উপলব্ধিকে অসাড় করে দিয়েছে। তাকে অতীন্দ্রিয় করে তুলেছে। মা ছাড়া তার অন্য কোন পরিচয় নেই। তার অন্যরূপ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তার অতীত দিগন্তে কী ছিল কে জানে! সে যেন মা হয়েই জন্মেছিল। কৈশোর ও যৌবনের উন্মেষে সে কেমনটি ছিল, কেমন ছিল তার সাকাঙ্ক্ষ প্রিয়ার ভাবরূপ, কেমন ছিল তার সাভরণা সীমন্তিনী মূর্তি। কেমন ছিল তার স্বল্পায়ু ও সঙ্ক্ষিপ্ত প্রেমের ব্যঞ্জনা? কোমল পত্রপুঞ্জ কেমন করে আন্দোলিত হলো, ঝড়ের দাপটে কবে সে অন্ধ ও অচেতন হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল মরণোন্মুখের সেবায়। নিজের জীবনের সতেজ রক্ত দিয়ে মুমূর্ষুর জীবনকে প্রাণবন্ত করে তুলল। মরণকে তার মধুময় করে দিল।...

কল্যাণ ভাবে আর দেখে। দেখে আর ভাবে।

কান্না নয়। দূরাগত ব্যথার গান। মঞ্চের বুকে বিয়োগান্ত একাঙ্কিকা।

কল্যাণ, কঠোর কল্যাণ ভাবুক হয়ে উঠল। পাষাণের বুক ফেটে জল বেরুল। উদ্ধত নির্মম দস্যু কবি বনে গেল।

শুক্তির সান্নিধ্যকে সে ভয় করে। তার শ্রদ্ধা সঙ্কুচিত হয়। পাছে তার স্বপ্নের শুচিতায় বাস্তবের অশুচি লাগে। তার গানের সুর কেটে যায়।

তাই সে দূরের আড়াল দিয়ে তাকে দেখে। অবাধ অগাধ চোখে তাকে দেখে।

নিমুকে সে তাকে দান করেছে। শুক্তির অন্তর তাই কল্যাণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সজল। তুজনে দেখা হলে এমনি আচ্ছন্নের মত সে তাবপানে তাকায় আর এমনি অদ্ভুত একটি হাসি তার অধরে ভেসে ওঠে যে কল্যাণ তার কোন মানে খুঁজে পায় না। তার বুকের নিচেটা থরথর কবে কেঁপে ওঠে। সে মুখ তুলে তারপানে চাইতে পাবে না। অথচ সে হাসিতে নেই তারুণ্যের মদিরতা। নেই কোন অদৃশ্য অঙ্গীভূত প্রতিশ্রুতি। নেই কোন অন্তরস্থ আসক্তি। নেই কোন ভাবাবেগেব প্রশ্রয়।

কল্যাণ মুগ্ধ শ্রদ্ধালু দৃষ্টি দিয়ে দূব থেকে তাকে দেখে। আর ভাবে।

নিজের অস্থির ভাবাবেগে সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। যুক্তি জ্ঞানহীন অবাধ্য হৃদয় তার অজানা ব্যথায় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অথচ নিজেই বুঝতে পাবে না কিসের এই তুঃসহ ব্যথা? কিসের এই বুকফাটা হাহাকার!

মন তার ছুটে পালাতে চায় কোন নিরুদ্দেশের পথে। এখানে আর সে ক্ষণকাল তিষ্ঠতে পারছে না।

নিজেকে তার ভয় হয়। নিজের উপর বিশ্বাস হারায়। মনে হয় নিমুব সম্পর্ক তাদের তুজনকে একটা অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধছে। পারাপারের সেতুর মত নিমু তাদের তুর্গম পথকে সুগম করে দিচ্ছে। অসম্ভাব্যকে সম্ভব করে তুলছে। নিমুর সত্য পরিচয়, তার অপ্রকাশ্য জন্মবার্তা তুজনেরই মনের আকাশকে মেঘমেতুর করে তুলছে।

গোপনতার দৃষ্টি বিনিময় তাদের ঘনিষ্ঠ করে দিচ্ছে। অলক্ষ্যে তারা যেন একটা মারাত্মক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। পরিণতির চেহারাটা কল্পনা করে সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। একটা ভয়াবহ বিভীষিকা, জীবনের অতীত কোন অদৃশ্যলোকের কদর্য একটা সঙ্কেত! তার চোখ বুজে আসে। বুক দুলে ওঠে। সে দুহাতে বুক চেপে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে।

অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলে সে খোলা জানালার পানে তাকায়। অবারিত নির্মল আকাশ পুরনো বন্ধুর মত উন্মুখ হয়ে তাকে হাত-ছানি দেয়। তাকে সান্ত্বনা দেয়। তাকে ধিক্কার দেয়। কল্যাণের আকাশ চিরদিন তাকে সত্যপথের ইঙ্গিত দিয়েছে। পথ ভুলিয়ে বিপথে নিয়ে যায় নি। তার হৃদয়ের নীড়হারা পাখি চিরদিন ওই আনীল আকাশের তলে তলে উড়েছে, আলোর সন্ধানে। তার আকাশ জ্বলন্ত, দীপ্ত। সদাচার শৃঙ্খলার আকাশ। মহত্ব, মনুষ্যত্বের আকাশ। সেখানে দুর্নীতি ছিল না। নীচতা ছিল না। নারী সম্বন্ধে উদাসীন সে চিরদিন। নারী দেহ তার চোখে বড় নয়, দামি নয়, একান্ত নয়। নারী অন্তরের অতুল ঐশ্বর্যকেই সে দাম দিয়ে এসেছে। সসম্মানে দেখেছে। নিষ্কামতার সেই অনাবিল স্তব্ধতা তার ভেঙ্গে গেছে। মুখর হয়ে উঠেছে, ফেনিল হয়ে উঠেছে তার রঙিন কামনা! এ যেন প্রকৃতির বিপর্যয়। স্বভাবের অট্টহাসি।

রমা এসে ঘরে ঢোকে। কল্যাণের চমক ভেঙ্গে যায়। কতক্ষণ যে সে রাশিভূত হয়ে অর্ধ-চেতন অবস্থায় বিছানার বুকে পড়েছিল কে জানে!

—কী গো? এখনো চিৎ হয়ে শুয়ে আছো যে? চান, খাওয়া দাওয়া করবে না?

রমার হাতে একখানা বড় খামের চিঠি।

চিঠি শুদ্ধ হাতখানা প্রসারিত করে তার দিকে এগিয়ে গেল রমা। মৃদু হেসে বললে, তোমার চিঠি।

—আমার চিঠি? দেহের আলস্য ঝেড়ে ফেলে সে সোজা হয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো।

রমা তারপানে তির্যক ভঙ্গিতে কটাক্ষ হেনে বললে, হ্যাঁ গো তোমারি। বোধ হয় ধারা লিখেছে। সরকারী মোহর করা খাম।

কল্যাণ আকস্মিক অন্ধ আবেগে তার একখানা হাত চেপে ধরে একটা ঝটকা দিয়ে চিঠিখানা তাব হাত থেকে কেড়ে নিল। ঝটকার প্রচণ্ড দাপটে রমা ছিটকে গিয়ে পড়ল কল্যাণের গায়ের উপর।

সদ্যস্নাতা রমার ভিজে মাথাটা তার বুকেব উপব আছড়ে পড়ল। ভিজে এলো চুলগুলো তার তপ্ত মুখখানাকে মুছিয়ে দিল।

—মাগো! এ কী কাণ্ড?

রমা অস্ফুট আর্তস্ববে চমকে উঠে বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকাল। কল্যাণ তার হাত ধরে আচ্ছন্নেব মত জিজ্ঞেস করল, লাগেনি তো?

— ঢং!

রমা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, কল্যাণেব বেদনা-কাতর ধূসর মুখচ্ছায়াব পানে চেয়ে।

তাব মন যেন জগতের ও-পাবে।

সে অপার বিস্ময়ে তার মুখেব পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার নড়বার শক্তি বইল না। হাতখানাকে তার'হাত থেকে মুক্ত কবে নিতে পাবল না। কল্যাণের হাতের উষ্ণতা তার শীতল শরীবকে তাতিয়ে তুলল। তার অনাহত কৌমার্যকে সংশয় বিচলিত কবে তুলল।

চিঠিপড়া শেষ করে কল্যাণ চোখতুলে রমার মুখপানে চাইল, ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে। কোন কথা বললে না। কী যেন ভাবছে, ভাবতে পারছে না। কী যেন বলতে গিয়ে বলতে পারছে না। তার

তপ্ত গাঢ় কালো চোখে অপরাধীর মত একটা ভয়ের আভাস। বিস্মরণের পার থেকে সে যেন স্মরণের পারে ফিরে আসবার জন্য কাতরাচ্ছে।

রমার ধৈর্য শঙ্কিত হলো। কল্যাণের স্বপ্নালু চোখের দিকে তাকিয়ে এমন একটা গোপন উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ দুলে ওঠে যে তার চোখে চোখ রাখতে পারে না। কী জানি কি নিদারুণ কথা সে বলে বসে! ধীরে-ধীরে সে নিজের হাতখানি তার হাতের ভিতর থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

কল্যাণ হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে হেসে উঠল। সে ক্ষিপ্রপায়ে উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

—ও কি করছো? ও কি করছো গো? তুমি কী পাগল হলে নাকি?

রমা তাকে বাধা দিতে গেল।

কল্যাণ স্নিগ্ধ স্বরে বললে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে রমা। জরুরী গোপন কথা।

কল্যাণের গলার স্বরে, তার বলার ভঙ্গিতে রমার ভয় গেল দূরে। তার সমস্ত শরীর সির সির করে উঠল। উত্তেজনায় ও লজ্জায় সে রাঙা হয়ে উঠল।

—ভয় পেয়ো না রমা। তোমার অসম্মান হবে না। মর্যাদার হানি হবে না।

—তা আমি জানি।

রমার গলার স্বর কাঁপছে। আবেশের মাধুর্যে চোখের লম্বা পাতাগুলি জড়িয়ে আসছে।

কল্যাণ তাকে অবিচলিত স্বরে প্রশ্ন করল, তুমি আমায় ভালোবাস না, রমা?

রমা চমকে গেল তার প্রশ্নের ভঙ্গিতে। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তার কম্পিত অধরে।

সলজ্জ ভঙ্গিতে উত্তর দিল, কেন, দেবতা প্রসন্ন হয়ে আজ বর

দেবে নাকি? পাথরে মাথা কুটলে কপালই ফোলে, পাথর ফেটে জল বেরোয় নাকি?

—শুধু জল নয় রমা আগুন ও বেরোয়। ফুল ও ফোটে। পারবে আগুনে পুড়তে? পারবে পাহাড়ের রুক্ষতায় ফুল ফোটাতে?

রমা চোখতুলে মুহূর্ত তার মুখের পানে তাকাল। কী দেখল সেই জানে। সে নতুন চোখ দিয়ে নতুন করে আবিষ্কার করল কল্যাণকে। কল্যাণের বলিষ্ঠ পৌরুষ ও মহৎ চরিত্র তার আয়ত্বাধীন ভেবে রমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

না, এ ছলনা নয়। এ ক্ষণিকের কামনাবেগ নয়। এ শারিরীক মোহাবেশ নয়। কল্যাণ তার শরনাগত। তার ভালবাসার কাঙাল। তার স্নেহ-মমতার কাঙাল।

কিন্তু হঠাৎ ওর চোখে সে মূল্যবান হয়ে উঠল কেমন করে? তাই ভেবে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। এ পরিবর্তন ঘটলো কেমন করে? কী আছে ওর ঐ চিঠিতে? কে লিখেছে ঐ চিঠি?

রমা ঠোঁট মুচড়ে চোখের কোণে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে প্রশ্ন করল, হঠাৎ তুমি এমন ক্ষেপে উঠলে কেন বলতো? কী হয়েছে? কে লিখেছে ঐ চিঠি? কী লিখেছে?

ভুলেই গিয়েছিল কল্যাণ চিঠির কথা। সে হাসতে হাসতে চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে বললে, এই চিঠিখানাই তো আমার পায়ের নিচের মাটি। নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। আমার কলকাতায় ভালো চাকরি হয়েছে রমা। এ তারি চিঠি। এক হপ্তার মধ্যে আমাকে সেই কাজে হাজির হতে হবে।

কপালে চোখ তুলে রমা বললে, ওমা, তুমি এখান থেকে চলে যাবে?

—হ্যাঁ। কিন্তু নিঃসঙ্গ একাকীত্বের অন্ধকারে আর আমি ফিরে যেতে পারবো না। পারবো না তোমার কোমল হাতের সেবা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে। তোমার দুহাত-ভরা সেবা আমাকে আয়েশী

করে তুলেছে। তোমার অকুণ্ঠ প্রীতি আমার মর্মের মূলে বাসা বেঁধেছে। তাই তোমাকে আমি সঙ্গে নিতে চাই। তোমাকে জীবনের সাথি করে জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাই। পারবে না তুমি আমার সাথি হয়ে আমার মনের নির্জনতা ঘোচাতে ?

অধোবদনে আরক্তমুখে রমা ঘোলাটে গলায় বললে, আমি কি তা পারবো ?

—পারবে না তুমি আমার সঙ্গে যেতে ?

—তা কেন পারবো না ? কিন্তু তুমি কি সুখি হতে পারবে আমাকে নিয়ে ?

—সুখি অসুখি তো মনেব একটা বিলাস কান্না। তুমি আমাকে ভালোবাস, আমি সেই ভালোবাসাব কাঁধে ভর দিযে পথ চলবো। একা চলতে গেলেই আমি হোঁচট-খাবো। পথ ভুল করবো। তুমি আমার হাত ধবো রমা। আমাকে আবৃত করে দাও। আমাকে তোমার মাঝে ঘুম পাড়িয়ে দাও। বিস্মৃতিব অতলে ডুবিয়ে দাও।

কল্যাণের কথাগুলো শাণিত তীরের ফলাব মত তার বুকের মাঝে এসে বিঁধলো। নিজেকে সামলানো দায় হয়ে উঠল। তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল। পা দুটো শরীবেব ভার সইতে পারে না নিজেকে এমনি দুর্বল আর অসহায় মনে হল। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে কম্পিত শূন্য চোখে কল্যাণের মুখের পানে চেয়ে রইল। তার দুই চোখ থেকে আরক্ত গণ্ড বেয়ে অশ্রুর দুটি দীর্ঘ ধারা নামলো।

সেই অশ্রুর অন্তরালে শাশ্বত প্রেমের প্রতিশ্রুতি। সর্বসমর্পনের আকিঞ্চন।

কল্যাণের তাকে ভালো লাগল। ভালোবাসতে ইচ্ছা হল। তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার কণ্ঠে বলল, ভয় করো না রমা। তোমার কোন ভাবনা নেই। তোমার প্রেম সত্য। সেই সত্যের

আলোয় আমার মনের অন্ধকার কাটিয়ে দাও। আমার অনিশ্চিত জীবনের আতঙ্কিত অশরীরী ছায়াকে ডুবিয়ে দাও। আমি ক্লান্ত। আমি ত্রাসিত। আমি জর্জরিত। আমাকে তুমি আড়াল করে দাঁড়াও। আমাকে আশ্রয় দাও তোমার রক্ষা দুর্গে।

রমা কি বুঝল সেই জানে। তবে সে অন্তরে ব্যথিত হল কল্যাণের আকুতিতে। তার অসহায় অনুনয়ে। আশ্চর্য মনে হয়। আশ্চর্য হবারি কথা। সে বিশ্বাস করবে কেমন করে যে তার প্রেমের আঁচ লেগে ইস্পাত গলে যাবে, তার সেবা যত্নের ঢেউ লেগে, রুক্ষ পাথর ক্ষয়ে চিক্কন ও গোলালো শালগ্রাম হয়ে উঠবে! বিশ্বাস করতে পাবে না সে নিজের এই অভাবিত সৌভাগ্যকে। কল্যাণের এই আত্ম সমর্পণের পরাভবকে। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কল্যাণের বলিষ্ঠ কান্তির পানে চেয়ে দেখল। তার মুখে শিশুর সারল্য, পলকহীন আয়ত লোচনে বরাভয়। বাত্যা-বিদারিত বিপিনের মত সর্বাঙ্গে আনন্দ ব্যাকুল ও বিধূর হয়ে উঠল। তার জীবনের এই পরম উৎসব লগ্নটিকে সে বৃথায় যেতে দিল না। নিঃশব্দে ভূমিষ্ঠ হয়ে সে কল্যাণের পদমূলে প্রণাম করল। মুক্ত চুলের গোছা দিয়ে তার চরণরেনু গ্রহণ করল।

কল্যাণ সাদরে ও সাগ্রহে তাকে বাহুবেষ্টনে বন্দী করল। তার বিস্মিত কুমারী অধরে এঁকে দিল প্রেমের প্রথম প্রতীক। সঙ্ক্ষিপ্ত একটি চুম্বন। তীরবিদ্ধ পাখি পাখা ঝাপটা দিয়ে ঝিমিয়ে পড়ল।

কল্যাণ তার বিক্ষিপ্ত এলোচুল গুলো সরমরাঙা মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বললে, আপন করে নিলুম। মিলনের আসল মন্ত্রপাঠ করলুম।

অর্ধ-নিমিলিত চোখে, প্রেম বিনম্র দৃষ্টি দিয়ে রমা তাকে শাসাল। তার বিধৃত অধরে বিবক্ষা, কিন্তু তার কণ্ঠ রইল অনুচ্চারিত।

কল্যাণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মুখখানা জলভারানত আষাঢ়

মেঘের মত। থমথমে। ললাটের শিরাগুলো ফুলে উঠল। সে একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে বললে, কিন্তু এ কথা যেন কারুর কাছে প্রকাশ না পায়। আমাদের এখান থেকে সকলের অজ্ঞাতে রাত্রির অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হতে হবে। তারপর—

রমা আতঙ্কিত হলো ঃ সে কি কথা গো? কেন? আমরা কী এমন অন্যায় করছি যে চোরের মত পালাবো? তুমি তো আমায় ধর্ম্মমতে বিয়ে করবে?

কল্যাণ দৃঢ়স্বরে বললে, নিশ্চয় করবো। এখান থেকে চলে গিয়ে আমরা বিয়ে করবো। আমরা নতুন সংসার পাতবো।

—তবে আবার লুকোচুরি কিসের? তুমি তো পরের বউ নিয়ে পালাচ্ছো না?

কল্যাণ মনের মাঝে ছটফট করতে লাগল। কী করে মনের কথাটাকে গুছিয়ে বলবে ভেবে পেল না। কেমন করে বলা যায় যে সে শুক্তির মন থেকে অদৃশ্য হতে চায়। নিজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে তার মনে ঘৃণা জাগাতে চায়। গায়ে কাদা মেখে সে নিজেকে কুৎসিৎ করে দেখাতে চায়। মুখে মুখোস এঁটে সে দানব সাজতে চায়।

সে ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললে, না তা নয়। ওরা জানতে পারলে আমার যাওয়া হবে না। বিশেষ নিমুকে তো তুমি জানো। সে কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না। তার চেয়ে কারুকে কিছু না জানিয়ে—

বাধা দিয়ে রমা বললে, তাই বলে বউদিকে না জানিয়ে, তার আশীর্বাদ না নিয়ে আমি নতুন পথে পা বাড়াব কেমন করে? আমার মা নেই। সেই আমার মা। আমার সব। আমার নতুন জীবনের এত বড় শুভ সূচনাকে তার শুভেচ্ছা ও মঙ্গল হাসিতে ভরিয়ে তুলবো না? না না। ও সব অমঙ্গল কথা মুখে এনো না। ওর দীর্ঘশ্বাস, ওর অভিশাপ আমাদের সমস্ত উৎসবকে ম্লান করে দেবে।

—কিন্তু আমি যে ওর জীবনে অভিশাপ হয়েই থাকবো রমা।

রমা বললে, ওর জন্যে তোমার কোন ভুর্ভাবনা নেই। এ কথা শুনলে ওর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

রমা দরজা খুলতে খুলতে কুটিল কটাক্ষ হেনে বললে, তুমি যেন কী! দরজা বন্ধ করা ঘরে ভুজনকে একসঙ্গে কেউ দেখলে কী ভাবতো বলতো?

॥ বারো ॥

এত বড়ো আনন্দ সংবাদে শুক্তি তো খুশি হলো বলে মনে হলো না। যে উৎসাহ, যে বিহ্বল মাদকতার ঘোরে খবরটা বহন করে এনেছিল রমা সে ঘোরটা পানসে হয়ে গেল। তার মনে হয়েছিল শুক্তি খবরটা শুনে আনন্দে ঝলমল করে উঠবে। তাকে আদর করে বুকে টেনে নিয়ে খুশিতে উথলে উঠবে। কিন্তু কই, তার মুখে ফুটলো না আনন্দের মৃদু রেখাটি। সে যেন খবরটা শুনেই গম্ভীর হয়ে গেল। এমনি নীরস, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তারপানে চাইল যেন সে গুরুতর কোন অপরাধ করে এসেছে।

রমা তার মুখের চেহেরা দেখে শুকিয়ে গেল। তার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল। তার সঙ্গীত স্পন্দিত শরীরে নেমে এলো একটা নিস্প্রাণ মন্থরতা।

কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলে, তুই কী বললি?

মাথা হেঁট করে অনুচ্চ কণ্ঠে রমা উত্তর দিল, আমি আবার কি বলবো?

মনে মনে হাসল শুক্তি তার সঙ্কোচ নিমীলিত মুখের ভঙ্গি দেখে। জিজ্ঞেস করলে, তুই তার প্রস্তাবের কোন জবাব দিলি না?

তারপানে নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকাল রমা।

—কী বললি? হাঁ, না কিছু একটা উত্তর তো দিলি?

—কী আবার বলবো? আমি একটা প্রণাম করে তার পায়ের ধূলো নিলুম।

মুখ টিপে হাসলো শুক্তি: তাই বল। তা সে কি বললে?

—জানি না যাও।

রমার মুখখানা লাল হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়লো।

শুক্তি গলার স্বরটাকে খুব মোলায়েম করে মিহিস্বুরে বললে, বলনারে কি বললে—আমাকে আবার লজ্জা কি ?

রমা এতক্ষণ বলবার জন্য ছটফট করছিল। বলবার সাহস পাচ্ছিল না। এইবার ব্রীড়াজড়িত নববধূর মত মিহিস্বুরে বললে, আমার হাতধরে তুলে নিয়ে একটা চুমু খেলে—

শুক্তিব সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগলো। বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। সে খিল খিল করে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললে, ঠিক বলছিস—একটা তো ? বেশি নয় ?

—তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

—আব পা ছুঁতে হবে না। তা হলে আধেক বিয়ে হয়ে গেছে বল ?

রমা মাথা হেঁট করে বললে, সে তো তাই বললে—

—কী বললে ?

—বললে, আপন কবে নিলুম। মিলনের আসল মন্ত্র পড়লুম।

—ওঃ! তা হলে তো বিয়ে হয়েই গেছে। তবে আবার কি ?

রমা সহসা উচ্ছ্বসিত আবেগে তার হাত ছুটি চেপে ধরে বললে, তোমার আশীর্বাদ পেলেই হয়। তুমি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ কবো বউদি। তুমি তো আমার মনের কথা জানো। ঠাকুরের দয়ায় ওর যখন মন হয়েছে—

তার কথার মাঝখানে শুক্তি যেন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল: তুই ওর মনের কথা কিছু জানিস ?

—আবার কি জানবো ? নিজেই যখন গা-পড়া হয়ে এতো কথা বললে—

—তা তো বটেই।

একটা দীর্ঘশ্বাসের তোড়ে কথাটা ঢেউয়ে দিল শুক্তি।

হঠাৎ সে রমাকে জড়িয়ে ধরে হেসে উঠলো: পুরুষ হাত

বাড়ালে মেয়েদের ধরা দেওয়া ছাড়া আর কোন গতি নেই—না রে রমা ?

তার হাসিটা রমার কানে করুণ কান্নার মতো শোনাল।

শুক্তির বুঝতে বাকি রইলো না যে কল্যাণ নিজেকে আবৃত করতে চায়। নিজের শক্তিতে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না বলেই নিজের চারিদিকে সে একটা আবরণ তৈরি করছে। যে আবরণের দুর্ভেদ্য আড়াল তাকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা রক্ষা করবে। এ যেন ঘুমের ওষুধ খাওয়া। চৈতন্য হারিয়ে অচেতন হবার জন্য মাদক সেবন করা। হাসি পায় শুক্তির।

রমা তাকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে, সেই ভালোবাসার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে নিজেকে গোপন করতে চায়। রমাকে সে ভালবাসেনা অবধারিত। শুক্তিকে যে ভালবেসেছে সে রমাকে ভালবাসতে পারে না। রমা অন্তবর্তী। রমা মাধ্যম। রমা ব্যবধান প্রাচীর। নিজেকে বাঁচাবার জন্য রমাকে তার প্রয়োজন। তাই রমার শরণাপন্ন হয়েছে। রমা তো জানে না তার মনের কথা। প্রেমাসক্ত মন বিশ্বাস করেছে তার প্রণয় নিবেদনে।

বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কল্যাণের চরিত্রের সততাকে শুক্তি শ্রদ্ধা না করে পারে না। কল্যাণের ভয় ভাবনা তো নিজের জন্য নয়। তার ভাবনা শুক্তির জন্য। পাছে শুক্তির নির্মল চরিত্রে তার প্রেমের আঁচ লাগে। পাছে শুক্তির বৈধব্যে অশুচি লাগে। শুক্তির কাছে অবিদিত নয় তার সে মনোভাব। সে ভয় মাঝে মাঝে শুক্তিকেও কাঁপিয়ে তোলে বই কি! তার স্মৃতির পৃথিবীতে তার স্বামীর ছায়া আজও অক্ষয় হয়ে আছে বলেই সে নিজেকে এতদিন বাঁচাতে পেরেছে। নইলে নির্মাল্যের মাঝে তার পিতাকে সে দেখতে পায় বই কি। শুধু চোখ দিয়ে একা তাকে দেখা নয়, নির্মাল্যের জন্মদাতার পাশে নিজের মাতৃত্বকে দাঁড় করিয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে নিজের মাতৃচেতনাকে উপলব্ধি করা। উপভোগ করা।

সে এক অস্বস্তিকর আনন্দময় অনুভূতি। সে অনুভবের আকাশ থেকে তার স্বামীর ছায়া মুছে যায়। কল্যাণের উত্তাপে সে আকাশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে তাপ শুক্তির গায়ে ছড়িয়ে পড়ে যেন তাকে মনে পড়িয়ে দেয় এই তাপে নিমুর জন্ম। সেই তাপের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে তার বৈধব্য-ক্লিষ্ট তুষার জমানো হিমশীতল যৌবন গলতে থাকে। তার অন্তর বাহির তপ্ত হয়ে ওঠে। তার মাতৃসত্তা স্বপ্নের প্রান্তর পেরিয়ে যখন কল্যাণের মাঝে এসে ধাক্কা খায় তখন তার অতীত যেন একটা অদৃশ্য শক্তির কাছে অবশ হয়ে যায়। তার মনে হয় এখনো তার যৌবনের বৃন্তে ফুল ফুটে আছে। বৈধব্যের বৈরাগ্যে শুকিয়ে ঝরে পড়েনি। তার সন্তানের উপস্থিতির মাঝে এখনো শুনতে পায় নিজের কামনা বাসনার প্রতিধ্বনি। বাইরে সে সব সময়েই উদাস, সব সময়েই অশরীরী কিন্তু অন্তরের চেতনায়, সন্তানের স্পর্শের মাঝে তার জন্মদাতার স্পর্শ পায়। শুনতে পায় অন্ধকার রাত্রির নিঃশব্দতা ছাপিয়ে কার আকুল আহ্বান। তার নির্জীব তপস্যা-ক্লিষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোর ক্ষীণ আর্তনাদ শুনতে পায়।

মাতৃত্বের মাঝেই তো নারীজীবনের পূর্ণতম পরিচয়। সন্তানই তার অতীত প্রেমের স্বাক্ষর। তার দেহের সৈকতে পুরুষের পদচিহ্ন। শরীরের পৃষ্ঠায় স্বপ্নময় মুহূর্ত মত্ততার তীক্ষ্ণ আঁচড়।

মাতৃত্বই প্রেমের সন্ধান ও সমাপ্তি।

শুক্তি নিমুর মধ্যে দিয়ে কল্যাণকে অনুভব করতো। নিমু কল্যাণের দ্বিতীয় সত্তা। তার প্রাণময় প্রতিনিধি। তার মধ্যে দিয়ে উৎসারিত হত কল্যাণের অনুরাগ। তার গোপন প্রেম। কবে কেমন করে জানে না, কল্যাণের সেই প্রেমের উপর শুক্তির একটা দাবি জন্মে গিয়েছিল। সে দাবি অধিকারের না হলেও অন্তরের। অনুভূতির। নিমুর স্বত্বে অবশ্য সে দাবির উৎপত্তি। যার স্বত্বেই হোক, দুটি হৃদয়ের এই অদৃশ্য যোগাযোগ অনস্বীকার্য। শুক্তির জীবনের অপার শূন্যতার মাঝে কল্যাণের স্নেহস্পর্শ একটা মধুর স্বাদ এনেছিল। তার নিঃসর্ত

মৌন ভালোবাসার মাঝে সে একটা গভীর তৃপ্তি পেয়েছিল। সে স্নেহকে সে এমনভাবে হারাতে পারবে না।

নিমু তাকে চায়। সে ও চায় তার নিষ্কাম ভালোবাসা। দেহকে অতিক্রম করে সে তাকে ভালোবাসাতে চায়। তার পূজা পেতে চায়। এ এক ধরণের মোহ। একটা বিলাস।

মনে একটা ভার নিয়েই কল্যাণ শুক্তির ঘরে এসেছিল। লজ্জার ভার।

শুক্তির মুখের স্নিগ্ধ মধুর হাসির উত্তাপে নিমেষে সে কুয়াশা কেটে গেল। সে মৃদু হেসে মাথা হেঁট করলে।

শুক্তি কোন ভূমিকা না করেই সরাসরি প্রশ্ন করে, এ সত্যি ?

—কি ?

—তুমি রামকে বিয়ে কবে নাকি ঘর সংসার পাততে চাও ?

কল্যাণ নিঃশব্দে মাথা নিচু করলে। কোন উত্তর দিল না।

শুক্তি মুখে আঁচল দিয়ে মিহিস্বুবে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলে, কি গো, কথা বলছো না যে ?

শুক্তি আবার একটা হাসির ঢেউ তুলল।

কল্যাণ বিস্মিত চোখ তুলে তারপানে চাইলো।

শুক্তির হাসি তাকে চমকে দিয়েছে। এ হাসি শুক্তিকে যেন মানায় না। শুক্তির হাসিব একটি বিশেষ রূপ আছে। সে হাসিতে জলেব কলধ্বনি নেই, বাতাসের উচ্ছ্বাস নেই। সে হাসিতে ফুল ফোটার শব্দ। চন্দ্রোদয়ের পদধ্বনি। সে হাসি নিরবয়ব। নিঃশব্দ। নিস্তরঙ্গ।

এ শুক্তির হাসি নয়। এ হাসি বন্য, প্রগলভ। কল্যাণ অবাক হয়ে তাই দেখছে।

শুক্তি বললে, আমাকে কি দেখছো গো, আমার কথার জবাব দাওনা।

কল্যাণ সঙ্কিপ্ত উত্তর দিল, তোমার সম্মতি পেলে।

শুক্তি আবার একটা হাসির ঢেউ তুলল: আমার সম্মতি? আমাব সম্মতির প্রয়োজন আছে না কি?

কল্যাণ প্রার্থনার ভঙ্গিতে স্বচ্ছ গলায় বললে, রমা তোমাকে মাতৃজ্ঞান কবে। তুমি ওর অভিভাবক। তোমার কাছে ওকে আমি ভিক্ষা চাইছি। তুমি ওকে আমায় দান করো।

শুক্তি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সে নিঃশব্দে তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টি দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করল। যেন তার প্রার্থনার আন্তরিকতাকে পরীক্ষা করছে মনে হল।

হঠাৎ সে তার কাছে সবে এসে গোপন কথা বলার মত অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, কিন্তু বমা হঠাৎ তোমাব চোখে এতো মূল্যবান হয়ে উঠলো কবে থেকে?

শুক্তি আরেকটা হাসির ঢেউ তুললো। কল্যাণ মুষড়ে গেল। শুক্তিব আজ যেন সে কুল খুঁজে পাচ্ছে না। তার মনের তল পাওয়া অসম্ভব। সে যেন দীর্ঘবাতেব একটি গাঢ় ঘুমেব পব সবেমাত্র জেগে উঠেছে। অন্ধকাব থেকে প্রখব আলোয় উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

সে তির্যক ভঙ্গিতে মধুব মোলায়েম কণ্ঠে বললে, সত্যি বলতে এতো দ্বিধা কেন?

ভরাডুবি হতে হতে মানুষ যেমন ভাবে কথা বলে ঠিক তেমনি ভাবেই কল্যাণ বললে, কাল। একটা অন্ধ আবেগে মবিয়া হয়ে আমার অন্তরের শূন্যতা বিপ্লব বাধিয়েছিল। সেই বিপ্লবেব ঝটিকাবর্তের মাঝে রমা গিয়ে দাঁড়ালো। ও ঘবে ঢুকতেই আমার মনের শূন্যতা ভরে গেল। বিপ্লব থেমে গেল। আমি নিজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালুম। জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। ওর হাত ধরে তীবে ওঠবার সাধ হলো। ওকে আশ্রয় করে জীবনে ফিরে যাবার সাধ হলো। কালকের আগে অবশ্য এ কথা কোনদিন মনে হয়নি।

—অর্থাৎ বানের জলের গতিরোধ করবার জন্যে রমার বাঁধ তুলে দিলে।

হেসে উঠলো শুক্তি। সেই গলগলিয়ে উছলে উছলে হাসি। এমন হাসি হাসতে আর কখনো দেখেনি তাকে কল্যাণ। হাসির তোড়ে বুক কেঁপে ওঠে। মাথার চুল সোজা হয়ে ওঠে।

হাসতে হাসতেই শুক্তি বললে, রমার বাঁধ যদি বালির বাঁধ হয়, রমাও যে বানের তোড়ে ভেসে যাবে ?

কল্যাণ মাথা হেঁট করলে।

কিছুটা সংযত হয়ে শুক্তি বললে, আসলে তা হলে রমার জন্যে হৃদয়ের কোন আকুলতা নেই। নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করবার জন্যে তাকে খুঁটি বানাতে চাও ? ঝড়ের নদিতে দিশেহারা বেতাহাল নৌকোকে তার চড়ায় নোঙর করতে চাও ?

কল্যাণ চোখে ধোঁয়া দেখল। তার চোখের সামনে দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল আলো নিভে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলো। সেই অন্ধকারে শিখার মত জ্বলছে শুক্তি। পূজোর প্রতিমার মত স্থির অবিচল দৃষ্টি দিয়ে কল্যাণের পানে চেয়ে আছে সে। তার সারা গায়ে পূজোর গন্ধ। একটু আগে পূজোর ঘর থেকে উঠে এসেছে। স্নিগ্ধ ললাটে চন্দনের তিলক। নাকে রসকলি। অনাবৃত বাহুমূলে তিলকসেবা। কাঁধে, পিঠে রাশীভূত কালোচুলের ঢেউ। মুখখানি করুণায় করুণ। তার ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ফুটন্ত ফুলের তন্ময়তা। যেন একটি ফুটন্ত কমল অধোমুখে জলতলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে। উদ্বুদ্ধ চেতনায় নিজের অতীতের ছায়া ভেসে উঠেছে কি ?

কল্যাণ বিহ্বল বিমূঢ় বিস্ময়ে তারপানে চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে তাকে আরতি করছে, মন তার স্তবের ঘোরে লুটিয়ে পড়েছে সেই ধ্যানরূপের চরণতলে। একে কামনা করা চলে না। একে স্পর্শ করা চলে না। এর ভালোবাসা পেলে একটি জীবনের পক্ষে প্রচুর পাওয়া। অনন্ত পরমায়ু।

লজ্জায় ধিক্কারে কল্যাণের চোখছুটি অশ্রুতে আকুল হয়ে উঠল। তার মনে হল নিজের অধৈর্য ও অসহিষ্ণু আচরণে সে শুক্তিকে অপমান করেছে। তাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণ সূর্যরশ্মি রেখার মত শুক্তির অধরে ভেসে উঠল একটি অনির্বচনীয় সূক্ষ্মহাসি। সঙ্গে সঙ্গে তার অনিমেষ আর্দ্র চোখছুটি থেকে ঝরঝর করে গালের উপর গড়িয়ে পড়ল রহস্যময় জলের ধারা, ঝরণা ধারার মত।

অদ্ভূত একটি স্পন্দহীন মুহূর্ত। সময় যেন তাদের মুখের পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সচল পৃথিবী অচল হয়ে গেছে। ঘরের মাঝে মৃত্যুর স্তব্ধতা। স্তব্ধতা শব্দে ভেঙ্গে পড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। কেউ কারুকে বোধ হয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ছুজনের মাঝে যেন একটা অশরীরী ছায়া শূন্যে লম্ববান। তারা যেন চলে গেছে এক নতুন জগতে, নতুন আকাশের নির্জনতায়, নতুন দিগন্তের অসীমতায়।

হঠাৎ বাইরে নিমুর আর রমার গলা শোনা গেল। ছুজনে ছুমদাম শব্দ করে হাসতে হাসতে উপরে উঠে আসছে।

শুক্তি চেয়ে দেখল কল্যাণেরও চোখে জল। শুক্তি উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, পুরুষের কান্না দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগে। যদিও নিজের চোখ শুকনো থাকে না। যাও, মুখ ধুয়ে এসো, রমা এসে তোমার চোখ জল দেখলে ভড়কে যাবে।

নিমু আর রমা ঘরে ঢুকতেই শুক্তি হাসিতে উথলে উঠে বললে, তোর রমা পিসীমার বিয়ে রে নিমু!

—য্যাঃ! মিছে কথা। রমা পিসীমার বিয়ে হয়নি নাকি?

শুক্তি হাসির ঘায়ে ফেটে পড়লোঃ নারে হয়নি, হবে। তোর মাস্টার মশায়ের সঙ্গে।

নিমু মুখ ভেংচে বললে, ধেৎ! অতো বড়ো মেয়ের আবার বিয়ে হয়নি?

শুক্তি হেসে উঠল। রমা হাসি চাপবার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিল।

শুক্তির হাসি থামে না। সে উথলে উথলে ককিয়ে ককিয়ে হাসে। বিশ্রী সে হাসির শব্দ। বিপর্যয়, বিলোড়িত, বিলম্বিত হাসি। বুক ফাটা, পাঁজর-দোলানো, দম-বন্ধ-করা হাসি। হাসি নয় যেন একটা ফিটের আক্রমণ। রমা চমকে গেছে। কল্যাণ আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। হাসির অনর্গল তোড়ে হঠাৎ বিষম লাগল শুক্তির। সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বার দুই কাশল। রমা গিয়ে তার পেছন থেকে বুকটা চেপে ধরল। শুক্তি আঁচলটা মুখ থেকে সরাতেই রমা চাপা আর্তনাদ করে উঠলো—ও কি গো?

আঁচলে এক ঝলক তাজা রক্ত। শুক্তি বিস্ফারিত নয়নে সেই দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

রমা শরীর থেকে মুছে গেল। সে আতঙ্কিত চোখে কল্যাণের পানে তাকাল।

কল্যাণ উদভ্রান্ত উদ্বেগে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, তুমি ওঁকে বিছানায় নিয়ে যাও রমা। আমি ডাক্তারকে ডাকতে বলি।

একটা শোকাকুল স্তব্ধতা বাড়িখানাকে গ্রাস করেছে। প্রাণের সাড়া নেই। স্পন্দন নেই। একটা কালোছায়া যেন বাড়িখানাকে আবৃত করে শূন্যে ঝুলছে। বিস্তৃত একখানা কালো চাঁদোয়ার মত। আকাশ মুছে গেছে। দিনের আলো অস্তিমের আভার মত অবরোহী। সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা কৃষ্ণকায় বিরাট জটায়ুর মত পাখা গুটিয়ে ঘরের নিঃশব্দতায় ঢুকে পড়েছে। পৃথিবীর যেন আর গতি নেই। স্রোত নেই। একটা রাশীভূত স্তব্ধতা। কায়াহীন অন্ধকারের প্রেতায়িত শূন্যতা।

দিনের শুভ্র আলোয় আর রৌদ্রের প্রখরতায় যে শুক্তির শানিত

ঔজ্জ্বল্য চোখ ঝলসে দিয়েছিল, সেই শুক্তি একটা শুভ্র সঙ্কেতের মত জলের তলায় চিকচিক করছে।

শুক্তি শয্যা নিয়েছে। শুভ্র শয্যার অতলে তার শুভ্রতর তনুদেহ একটি সদ্যছিন্ন রজনীগন্ধার দণ্ডের মত লুটিয়ে পড়ে আছে।

ডাক্তারের নির্দেশ বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম। বিপজ্জনক কোন রোগের সূচনা। প্রথম আক্রমণ। বিশ্রাম ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ। অতীতের ইতিহাস তার প্রতিকূল।

কাঁশির দমকে রক্ত উঠেছিল। কাশি থেমে গেছে। হিক্কা থামেনি এখনো।

কল্যাণ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

তার অন্তরাত্মা হাহাকারে ছিঁড়ে পড়ছে। সে স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে কলকাতায় লোক পাঠিয়েছে টি বি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আনতে। ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে গেছে। শুধু কল্যাণ নয় এখানকার ডাক্তার ও ভয় পেয়েছে।

রমা শুক্তির শয্যার পাশে গিয়ে বসেছে। রোগের শুশ্রূষায় তার দক্ষতা আছে। কিন্তু আকস্মিকতার প্রচণ্ড আঘাতে সে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত। একটা শান্ত সংসারকে তছনচ করে দিল।

রমা হতবাক হয়ে গেছে। নিজের দুর্ভাগ্যই তার চোখে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তার চিব বিড়ম্বিত জীবনে সুখের আলোর একটু আভাস ফুটতেই নেমে এলো মহানিশার অন্ধকার। কী কপাল নিয়েই সে সংসারে এসেছিল। হাসির মুখ দেখা তার ভাগ্যে নেই। যার সংস্পর্শে এসেছে তাকেই দুঃখ দিয়েছে। সে যেন আঁচল ভরে নিয়ে আসে অভিশাপ। যার গায়ে সে আঁচলের হাওয়া লাগে সে-ই বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। তার জীবন যেন একটা ধারাবাহিক বর্ষা। অন্য কোন ধাতুর আবর্তন নেই। তার দুচোখ ছাপিয়ে অনর্গল অশ্রুর ধারা নামে। শুক্তির পানে সে চাইতে পারে না। অশ্রুতে আকুল হয়ে আসে

তার দু-চোখ। কৈশোর সীমান্ত থেকে আজ পর্যন্ত জীবন তার শুক্তি নিয়ন্ত্রিত। শুক্তিই তার ভাগ্যবিধাতা। শুক্তিকে বাদ দিয়ে সে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না। শুক্তি তাকে গলগ্রহ ভাবেনি কোন দিন। পরমাত্মীয়ের মত তাকে ভালোবেসেছে। তাই শুক্তির বিপদাশঙ্কায় তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছে।

আর কল্যাণ? কল্যাণের চারিপাশে আগুন জ্বলে উঠেছে। পায়ের নিচে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের উপর সে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছটফট করে বেড়াচ্ছে। বেরুবার পথ পাচ্ছে না। তার বেরুবার পথ কোথা? সেই তো দায়ি। নিঃসন্দেহ সেই দায়ি। প্রচণ্ড আঘাতে শুক্তিকে সে শয্যাশায়ী করে দিল, তার ভঙ্গুর দেহকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। জানতো বই কি সে শুক্তির মনের কথা। জেনে শুনে তাকে সে মর্মান্তিক আঘাত করেছে। সে টাল সামলাতে পারল না। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। তার কুসুম পেলব সূক্ষ্ম অনুরাগ উপেক্ষার উত্তাপে ঝলসে গেল।

সাময়িক উত্তেজনায় শুক্তির রোগের সূত্রপাত। সে উত্তেজনা তার রক্তে সঞ্চারিত করেছে কল্যাণ। তার গোপন ভালোবাসাকে সে ব্যাহত করেছে। চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে তার আত্মবিশ্বাসকে। তার অভিনিবেশকে। সে হাসি দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিল নিজের ব্যর্থতার অপমানকে। হতাশার মর্মান্তিক বেদনাকে। সে তো হাসি নয়। সে আর্তনাদ।

সে শুক্তির কাছেও যেতে পারে না, কাছ থেকে সরে যেতেও পারে না। ঘরে থাকতে পারে না। আবার ঘরের সীমানা ছেড়ে দূরে যেতে পারে না। যে মন্দিরকে সে অপবিত্র করেছে তারি চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে। সারাদিন সে ঘরের বাইরে উদভ্রান্তের মতো পায়চারি করেছে আর মাঝে মাঝে খোলা জানলা দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে শয্যায় স্তূপীভূত শুক্তিকে নিরীক্ষণ করেছে। নিমুকে কাছে ডেকে কখনো বুকে চেপে ধরেছে। কখনো বারান্দার রেলিং-এ বুক দিয়ে

চোখ বুঁজে দেবতার সন্ধান করেছে, যে দেবতা তার মনের কথা জানেন।

সময়ের হিসেব নেই। দিন যে কখন ফুরিয়ে সন্ধ্যে হয়েছে তার খেয়াল নেই।

কলকাতা থেকে ডাক্তার বাবুর মোটর এসে বাইরে দাঁড়াল। বাইরে একটা ব্যস্ততা, একটা অনুচ্চ কলরব শোনা গেল। কল্যাণ নিচে নেমে গেল। এখানকার ডাক্তারকে খবর পাঠানো হলো।

ডাক্তার বাবু শুক্তির পূর্ব ইতিহাস ও বিবাহ কাহিণী শুনে চমকে গেলেন। স্থির, অবিচল দৃষ্টি দিয়ে শুক্তির একখানি হাত ধরে মুখ পানে চেয়ে রইলেন। কী দেখলেন তার মুখে, কী অনুভব করলেন তার রক্তস্রোতে তিনিই জানেন, তবে ডাক্তার বাবুর স্নেহার্দ্র ভাবময় মুখের রেখায় আর ছলছল চোখের অতলে একটা সশ্রদ্ধ নিবেদন ফুটে উঠলো। চিকিৎসক নয়, পৃথিবীর মানুষ তার জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে মেয়েটিব প্রেমের মহিমাকে অভিনন্দন জানাল। শুক্তিব বিবর্ণ ঠোঁটের কোনায় বুঝিবা একটি মুমূর্ষ হাসির রেখা ভেসে উঠল। গৌরবের স্বচ্ছ আলোয় মুখখানি মুহূর্ত জ্বলে উঠল।

ডাক্তারের ঘোষণা সঙ্ক্ষিপ্ত: গ্যালপিং কণসমশন। আমি নিঃসংশয়। তবুও কার্ডিওলজিষ্ট কে দিয়ে একটা স্কায়াগ্রাম করিয়ে নিন।

চমকাবার কথা নয়। এ তো জানা কথা। কল্যাণ স্তব্ধ হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মনে হলো এ তো তার পীড়া নয়, ব্যাধি নয়। এ তার দেহব্যাপী স্বামীর স্পর্শ। স্বামীর ডাক। আর সে অপেক্ষা করবে না।

ঘনীভূত হয়ে এলো রাত্রির অন্ধকার। অন্ধকারের স্তব্ধতায় তার মনে হলো যেন ছায়াচারীর দল প্রেতলোক থেকে নেমে আসছে পৃথিবীর নিঃশব্দতায়। ঘুলিয়ে ওঠে রাত্রির নিবিড় স্তব্ধতা। মনে হয় একসঙ্গে যেন কারা অন্ধকারে চলা-ফেরা করছে। কল্যাণের গা ছম-ছম করে। মনে হয় যেন বাড়ির আতঙ্কিত রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা

তাকে তাড়া করেছে। সে ভয় চকিত দৃষ্টিতে অন্ধকারের পানে তাকায়।

নিঃশব্দে রমা এসে তার পাশে দাঁড়ায়। বলে, ঘুম থেকে উঠে তোমাকে খুঁজছে। তুমি ঘরে যাও। আমি নিচে যাচ্ছি।

—কেমন আছে এখন? হেঁচকিটা বন্ধ হয়েছে?

—হেঁচকি বন্ধ হয়েছে কিন্তু কাশির সঙ্গে আর একবার রক্ত দেখা দিয়েছে—তবে কম। ডাক্তার কি বলছে?

কল্যাণ শক্তি সংহত করে বললে, কী আবার বলবে? সেরে যাবে।

ঘরের স্তব্ধতার মাঝে রাশীভূত ফুলের মত শুক্তিকে দেখে কল্যাণের মনে হলো যেন সে একটা দুঃস্বপ্নের ভয়াবহ বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের নিরাপদ নিশ্চিন্ততায় আবার ফিরে এসেছে। আর তার মনে কোন ছায়া নেই। দুঃস্বপ্নের দুরন্ত সেই। কল্যাণকে দেখে তার মুখে একটি স্বচ্ছ হাসি ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে বললে, কি গো, তোমার যে আর দেখাই নেই? বসো।

কল্যাণ তার শয্যাপ্রান্তে একটা টুলের উপর বসলো।

শুক্তি শাড়ির আঁচলটা মাথার উপর টানতে টানতে বললে, আরেকটু কাছে সরে এসো। অনেক কথা বলবার আছে।

মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে প্রতিবাদ তুললো কল্যাণ, অনেক কথা বলতে ডাক্তারের মানা আছে।

হাসলো শুক্তি মৃদুরেখায়। বললে, ডাক্তারদের মানা মানুষের পরমায়ু বাড়াতে পারে না।

—ছেলেমানুষী করোনা শুক্তি।

এদিক ওদিক চেয়ে শুক্তি জিজ্ঞেস করলে, রমা গেল কোথা?

—নিচেয় গেছে।

শুক্তি কল্যাণের হাতের উপর নিজের একখানা হাত রেখে আদরের সুরে বললে, এখনো যদি তোমার কাছে একটু ছেলেমানুষী না করি, তবে কখন আর করবো?

কল্যাণের চোখদুটি ছলছল করে এলো। তার মর্মমূল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

—আমার চেয়ে ছেলে মানুষ তুমি। আমার ভয়ে তুমি কী-কাণ্ডটা করলে বলো দেখি!

কল্যাণ প্রশ্নভরা চোখে তার পানে তাকাল।

শুক্তি বললে, যাকগে। আগে একটা কথা বলি শোন। রমাকে তুমি আমার কাছে চেয়েছিলে। আমি সানন্দে তাকে তোমায় দিলুম। যদিও আগেই তাকে আপন করে নিয়েছো।

তার হাতে একটা টিপুনী দিয়ে শুক্তি তার পানে চেয়ে অপাঙ্গে হাসলো।

কল্যাণ নিঃশব্দে মাথা নিচু করলো। শুক্তি বললে, এইবার নিজের ছেলেমানুষীব কথাটা খুলে বলি শোন। জেনে রাখা ভালো। তবে এ-কথা শুধু তোমার জন্যে আব কারুর জন্যে নয়। যেমন নিমুর জন্মবৃত্তান্ত। কাশীতে সেই গোপনতার মধ্যে দিয়েই তোমার সঙ্গে অন্তবেব যোগাযোগ ঘটলো। নিমুব মাব অন্তবের কৃতজ্ঞতা নিমুর বাবাকে স্বাগত জানালো। সেই গোপনতাই আমার কাল হলো।

—আমি জানি।

শুক্তি হাসি মুখে বললে, কিন্তু আমাব ভালোবাসা যে এমন হিংস্র আব বন্য তা আমি জানবো কেমন কবে? আমি ক্ষেপে উঠলুম, আমি পাগল হয়ে গেলুম রমাব কথা শুনে। বমার ওপরও আমার হিংসে জাগলো! কী লজ্জা! কী ঘেন্না। অথচ নিজের মনে কোন লোভ নেই। কোন প্রত্যাশা নেই! মেয়েদের মনের তলায় এতো পাঁক!

শুক্তি চোখ বুজলো।

কল্যাণ শূন্যচোখে তার দিকে চেয়ে রইলো।

শুক্তি বললে, তাই মনে হয় ঈশ্বর আমায় রক্ষা করেছেন। আর সে আমায় ভোলেনি। আমি নিজেকে ভুলে গিয়েছিলুম।

সে আমায় পরম মুহূর্তে স্মরণ করে আমায় লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে। আমায় মিথ্যে হতে দেয়নি।

সমস্ত ঘরটা যেন চারিদিক থেকে হাহাকার করে উঠল।

শুক্তি বললে, তুমি যেন আমায় ভুল বুঝোনা। আমার জীবনের গোপনতা তোমার কাছে গচ্ছিত রইলো। তোমার কাছে কী যে চেয়েছিলুম আমি নিজেই জানিনা—বুঝি না। কোন কিছুই যে চাইনি এ-কথাও বলতে পারবো না। আমার পথ ভুল নয়। শুধু একটা মিথ্যে পরিচয় নিয়ে সেই পথে চলতে চেয়েছিলুম। মাতৃত্বের রাজবেশ পরিয়ে নিজের বন্ধ্যা বৈধব্যকে ঢাকতে চেয়েছিলুম। নিমুর মা সেজে ভুলতে চেষ্টা করেছিলুম বৈধব্যের সম্পদকে। হ্যাঁ, সম্পদ বই কি। স্বল্পায়ু দাম্পত্যের সে স্মৃতি সমারোহ। আমার পরাজয় তো সেইখানে। সংসারের চোখে ধূলো দিয়ে নিজের নিস্ফল মাতৃত্বকে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিলুম। পরের সন্তানের জননী সেজে মাতৃত্বের গৌরব অনুভব করেছিলুম। মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটাতে চেয়েছিলুম।

শুক্তির মুখে ফুটে উঠলো করুণ মুমূর্ষু হাসি। একটু থেমে হাসিতে ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে বললে, তা কি হয়? মিথ্যেব ওপর কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। হতে পারে না।

—চুপ করো শুক্তি। ও সব কথা মনে করো না। তোমার দুর্বল স্নায়ুর পক্ষে উত্তেজনা মারাত্মক।

শুক্তি চোখ বুজলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিমীলিত নয়নে আস্তে আস্তে বললে, সংসারের চোখে আমি দেবী হয়েই রইলুম। একজন অন্তত জেনে রাখো যে আমি দেবী ছিলুম না। স্থূল কামনার পৃথিবীতে আমিও ধূলো মাটির মানুষ। পৃথিবীর কলঙ্ক স্পর্শ থেকে মুক্ত নয় আমার মন। আমার মনেও কলঙ্কফুল ধরেছিল। মাতৃক্ষুধার নিচেই তো নারীক্ষুধা। সন্তানের মাঝে তার জন্মদাতা উপস্থিত। তার চলাফেরায়, কথাবার্তায় তার পিতার অকুণ্ঠ পরিচয়।

সন্তানই যে পিতার প্রাণময় প্রতিনিধি। মায়ের মনের পর্দায় সন্তানই তার পিতাকে গাঢ় করে ফুটিয়ে তোলে। মা-র চোখে কামনার বাতি জ্বেলে দেয়। নিমু শত্রু তোমাকেই তুলে ধরে তার ছায়াকে ঘোলা করে দিল। কী পাপ! আমার তপস্যালোকে ক্ষুদ্র রাক্ষসের মতো উদয় হয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

শুক্তি চোখ বুজলো।

তার নিমীলিত চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে পাশ ফিরে শুলো।

কল্যাণ একটা অশরীরী ছায়ার মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

রমা এসে ঘরে ঢুকলো: ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।

রমাব গলা পেয়ে পাশ ফিরলো শুক্তি। চকিত হয়ে প্রশ্ন করলো, ত্রয়োদশী কবে রে রমা?

রমা তার গায়ে হাত রেখে বললে, কাল তো একাদশী—কেন?

শুক্তি বললে, ত্রয়োদশীর দিন নিয়ে যাবে বলছে। সর্বশুদ্ধ ত্রয়োদশী। শুভ দিন দেখে তো নিয়ে যাবে।

—কী বলছো? কে বলে গেল?

শুক্তির মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার ঘুমন্ত চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঝাঁঝালো গলায় বললে, কে আবার? তোর দাদা। এই তো চলে গেল। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল।

—বকো না। ওষুধ খাও।

—তা না হয় খাচ্ছি। কিন্তু জানিস তো কী রকম একগুঁয়ে মানুষ। ওর কথার নড়চড় হবে না।

ওষুধের ট্যাবলেট-টা গিলে আবার আপনমনে বললে, না, না। ওর সায়ে সায় দেওয়াই ভালো, নইলে আবার অভিমানে মুখ ঝুলে যাবে। না, না। ওর মনে ব্যথা দিতে আমি পারবো না। রোগা মানুষ।

সে আমায় পরম মুহূর্তে স্মরণ করে আমায় লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে। আমায় মিথ্যে হতে দেয়নি।

সমস্ত ঘরটা যেন চারিদিক থেকে হাহাকার করে উঠল।

শুক্তি বললে, তুমি যেন আমায় ভুল বুঝোনা। আমার জীবনের গোপনতা তোমার কাছে গচ্ছিত রইলো। তোমার কাছে কী যে চেয়েছিলুম আমি নিজেই জানিনা—বুঝি না। কোন কিছুই যে চাইনি এ-কথাও বলতে পারবো না। আমার পথ ভুল নয়। শুধু একটা মিথ্যে পরিচয় নিয়ে সেই পথে চলতে চেয়েছিলুম। মাতৃত্বের রাজবেশ পরিয়ে নিজের বন্ধ্যা বৈধব্যকে ঢাকতে চেয়েছিলুম। নিমুর মা সেজে ভুলতে চেষ্টা করেছিলুম বৈধব্যের সম্পদকে। হ্যাঁ, সম্পদ বই কি। স্বল্পায়ু দাম্পত্যের সে স্মৃতি সমারোহ। আমার পরাজয় তো সেইখানে। সংসারের চোখে ধূলো দিয়ে নিজের নিস্ফল মাতৃত্বকে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিলুম। পরের সন্তানের জননী সেজে মাতৃত্বের গৌরব অনুভব করেছিলুম। মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটাতে চেয়েছিলুম।

শুক্তির মুখে ফুটে উঠলো করুণ মুমুর্ষু হাসি। একটু থেমে হাসিতে ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে বললে, তা কি হয়? মিথ্যেব ওপর কোন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। হতে পারে না।

—চুপ করো শুক্তি। ও সব কথা মনে করো না। তোমার দুর্বল স্নায়ুর পক্ষে উত্তেজনা মারাত্মক।

শুক্তি চোখ বুজলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিমীলিত নয়নে আস্তে আস্তে বললে, সংসারের চোখে আমি দেবী হয়েই রইলুম। একজন অন্তত জেনে রাখো যে আমি দেবী ছিলুম না। স্থুল কামনার পৃথিবীতে আমিও ধূলো মাটির মানুষ। পৃথিবীর কলঙ্ক স্পর্শ থেকে মুক্ত নয় আমার মন। আমার মনেও কলঙ্কফুল ধরেছিল। মাতৃক্ষুধার নিচেই তো নারীক্ষুধা। সন্তানের মাঝে তার জন্মদাতা উপস্থিত। তার চলাফেরায়, কথাবার্তায় তার পিতার অকুণ্ঠ পরিচয়।

সন্তানই যে পিতার প্রাণময় প্রতিনিধি। মায়ের মনের পর্দায় সন্তানই তার পিতাকে গাঢ় করে ফুটিয়ে তোলে।, মা-র চোখে কামনার বাতি জ্বেলে দেয়। নিমু শত্রু তোমাকেই তুলে ধরে তার ছায়াকে ঘোলা করে দিল। কী পাপ! আমার তপস্যালোকে ক্ষুদ্র রাক্ষসের মতো উদয় হয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

শুক্তি চোখ বুজলো।

তার নিমীলিত চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে পাশ ফিরে শুলো।

কল্যাণ একটা অশরীরী ছায়ার মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

রমা এসে ঘরে ঢুকলো : ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।

রমার গলা পেয়ে পাশ ফিরলো শুক্তি। চকিত হয়ে প্রশ্ন করলো, ত্রয়োদশী কবে রে রমা?

রমা তার গায়ে হাত রেখে বললে, কাল তো একাদশী—কেন?

শুক্তি বললে, ত্রয়োদশীর দিন নিয়ে যাবে বলছে। সর্বশুদ্ধ ত্রয়োদশী। শুভ দিন দেখে তো নিয়ে যাবে।

—কী বলছো? কে বলে গেল?

শুক্তির মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তার ঘুমন্ত চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঝাঁঝালো গলায় বললে, কে আবার? তোর দাদা। এই তো চলে গেল। সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল।

—বকো না। ওষুধ খাও।

—তা না হয় খাচ্ছি। কিন্তু জানিস তো কী রকম একগুঁয়ে মানুষ। ওর কথার নড়চড় হবে না।

ওষুধের ট্যাবলেট-টা গিলে আবার আপনমনে বললে, না, না। ওর সায়ে সায় দেওয়াই ভালো, নইলে আবার অভিমানে মুখ ঝুলে যাবে। না, না। ওর মনে ব্যথা দিতে আমি পারবো না। রোগা মানুষ।

একটু থেমে হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠলো শুক্তি। বললে, বলে কি জানিস, ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় দুজনে হাতধরাধরি করে চলবো। সমুদ্দুরের ধারে যেমন বেড়াতুম।

রমা তার গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে দিতে দিতে বললে, বেশী কথা বলোনা বউদি! এইবার ঘুমোও। আলো নিবিয়ে দিই।

শুক্তি মাথা নেড়ে বললে, না না। আলো নিবিয়ে দিসনি। অন্ধকারে আমি যাবো কেমন করে? তোরা আমাদের পথে আলো দেখাবি না অন্ধকার করে দিচ্ছিস?

কল্যাণ বললে, বেশ। আলো জ্বলুক। তুমি ঘুমোও।

—তুমি এখনো বসে আছো কেন? নিমু একলা রয়েছে যে। ঘরে যাও।

তিনদিন কেটে গেল।

যত না রোগের যন্ত্রণা, তত তার প্রতীক্ষার স্তব্ধতা। তার জীবনের সমস্ত সন্ধান, সমস্ত আকুলতা, সমস্ত জিজ্ঞাসা শেষ হয়ে এসেছে তার স্বামীর আগমন প্রত্যাশায়। তার স্পর্শের স্বপ্নে তার শরীর রোমাঞ্চিত। তার নিবিড় সান্নিধ্যের পিপাসায় তার প্রাণ কণ্ঠাগত। তার চেতনা থেকে আর সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার স্বামী এসে বাসা বেঁধেছে তার চেতনার ফাঁকে ফাঁকে। তার অস্তমান চাঁদের মত শরীরের হিমশুভ্র ছায়ায়। সে যেন নববধূর সঙ্কোচ সৌরভ নিয়ে স্বামীর প্রতীক্ষায় শয্যার প্রান্তে শুয়ে আছে—স্বামীর শূন্যস্থান টুকুর দিকে হাত মেলে দিয়ে। দীর্ঘ বিরহের পর সে যেন স্বামী মিলন প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে।……

তারপর এলো সেই ত্রয়োদশী।

শুক্তির বহুপ্রত্যাশিত সর্বশুদ্ধ শুভ ত্রয়োদশী!